POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(আলে ইমরান: ৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 47

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 20 Nov, 2025 28 জামাদিউল আওয়াল-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন যে তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না এবং তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন যে তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না এবং তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করবে। বাস্তবে ঐশী রবুবিয়াতের প্রকৃতি বিবেচনা করো: মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় একটি শিশু হিসেবে, যার নিজের কোনো শক্তি-সামর্থই থাকে না। সেই অবস্থায় দেখো-মা কত ধরনের সেবা-যত্ন করে, এবং সেই সময়ে মায়ের ওপর যে নানাবিধ দায়িত্ব আসে, পিতা কীভাবে সেগুলোর ভার বহন করেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর নিখাঁদ অনুগ্রহে এই দুর্বল সৃষ্টির যত্নের জন্য দুটি স্থান নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁর নিজ প্রেমের আলোকচ্ছট থেকে তাঁদের মধ্যে ভালোবাসার একটি ঝলক স্থাপন করেছেন। তবে মনে রাখা উচিত যে পিতা-মাতার ভালোবাসা সাময়িক, কিন্তু আল্লাহ 'র ভালোবাসা সত্য ও চিরস্থায়ী। বাস্তবেই, আল্লাহ যখন পর্যন্ত হৃদয়ে ভালোবাসার ক্ষমতা সঞ্চার না করেন, কোনো মানুষ-সে বন্ধু হোক, সমকক্ষ হোক, অথবা কোনো শাসক-কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে না। আর এটাই আল্লাহর পরিপূর্ণ রবুবিয়াতের রহস্য: পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের প্রতি এমন ভালোবাসা প্রদর্শন করেন যে তাঁরা মন খুলে সকল কষ্ট বহন করেন এবং সন্তানের জীবনের জন্য নিজেদের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। (রুইদাদ জলসা-এ-দু'আ, পৃ. ১১)

"অতএব তাদেরকে 'উফ্' পর্যন্ত বলো না, এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।"

এর অর্থ হলো: পিতা-মাতার প্রতি কোনো বিরক্তির শব্দ উচ্চারণ করবে না, এবং এমন কোনো কথা বলবে না যা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। যদিও এই আয়াতের প্রত্যক্ষ সম্বোধনকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রকৃতপক্ষে এ নির্দেশ সমগ্র উম্মতের প্রতি, কারণ তাঁর পিতা-মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। এই আদেশের মধ্যে আরও একটি সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা নিহিত আছে: একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে-যদি আল্লাহ নিজে রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, "তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান করো এবং প্রতিটি কথোপকথনে তাদের মহিমান্বিত মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখো," তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের পিতা-মাতাকে সম্মান করার দায় কত বেশি হওয়া উচিত। নিম্নোক্ত আয়াতও এই দিকেই ইঙ্গিত করে: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"

এ আয়াতে মূর্তিপূজকদের-যারা মূর্তি পূজা করে-সতর্ক করা হয়েছে যে মূর্তিগুলো কিছুই নয়; তারা তোমাদের ওপর কোনো অনুগ্রহ করেনি। তারা তোমাদের সৃষ্টি করেনি, তোমরা শিশু অবস্থায় থাকাকালে তারা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণও করেনি। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনার অনুমতি থাকত, তবে আল্লাহ নির্দেশ দিতেন তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকেও উপাসনা করো, কারণ তাঁরাও এক অর্থে 'রূপক রব'। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি জীব, মানুষ থেকে শুরু করে বন্য পশুপাখি পর্যন্ত, তাদের সন্তানদের অকালে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। সুতরাং আল্লাহর রবুবিয়াতের পরে পিতা-মাতারও এক ধরনের রবুবিয়াত রয়েছে; তবে তাঁদের এই স্নেহ-স্তুতি ও তত্ত্বাবধানের উদ্দীপনাও আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকেই উদ্ভূত।

(হাকীকতুল-ওহী, পৃ. ২০৪-২০৫)

এখন সমগ্র পৃথিবী ইসলামী তাওহীদের দিকে ঝুঁকছে, এবং এমনকি মুশরিক জাতিগুলোও-যদিও তারা শির্ক করে-ঈশ্বরের একত্ব অস্বীকার করতে সাহস পায় না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৬৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে "নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর আছ" এই বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন যে দুনিয়ার বিরোধিতা যতই তীব্র হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদত্ত শিক্ষাই বিজয়ী হবে। একদিন সব ধর্মের পতাকা ইসলাম-এর পতাকার নিচে নত হবে। অতএব লক্ষ্য করুন, যখন পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তখন দুনিয়ার অবস্থা কেমন ছিল। খ্রিস্টানরা তিনটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত; জরথুস্ট্রিয়ানরা আলো ও অন্ধকারকে দুই পৃথক দেবতা মনে করত; মাগীরা আগুনের পূজা করত; মূর্তিপূজকেরা লাত ও মানাতকে দেবতা মনে করত; আর দুনিয়াজুড়ে বহুদেববাদই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ ইসলাম যে একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছে, তা এমনভাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে খ্রিস্টানরা নিজেদেরও এক ঈশ্বরের উপাসক বলে বর্ণনা করে, এবং মূর্তিপূজকেরাও স্বীকার করে যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক-তাদের মূর্তিগুলো কেবল মধ্যস্থতাকারী, যাদের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করতে চায়।

যখন ইসলাম ঘোষণা করল যে ঈশ্বর এক, তখন মক্কার লোকেরা এতটাই বিস্মিত হলো যে বলতে লাগল: "সে কি এতসব দেবতাকে এক দেবতা বানিয়ে ফেলল? এটি তো এক আশ্চর্য ব্যাপার!" (সাদ ৩৮:৬)। তারা মনে করত দেবতা অনেক, আর নবী-যিনি এক ঈশ্বরের কথা বলছেন-সম্ভবত সব দেবতাকে কেটে-কেটে একটিতে পরিণত করেছেন। কিন্তু এখন সমগ্র পৃথিবী ইসলামী তাওহীদের দিকে ঝুঁকছে, এবং এমনকি মুশরিক জাতিগুলোও-যদিও তারা শির্ক করে-ঈশ্বরের একত্ব অস্বীকার করতে সাহস পায় না।

অন্য বিষয়েও একই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপ বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের অনেক অংশে, যেসব ধারণাকে একসময় আপত্তিকর বলা হতো, সেগুলোই ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। আমি যখন চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাই, তখন জানতে পারি আমার আগমনের কয়েকদিন আগে, লন্ডনের একটি বড় অপেরা হাউসে কর্মরত এক বিখ্যাত সংগীতশিল্পী-একজন পিয়ানিস্ট ও পারফর্মার-ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মিশনারিরা আমাকে তাঁর আকর্ষণের বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত কারণটি জানান-যা প্রচলিত কারণের বিপরীত এবং যা প্রকাশ করে আল্লাহ তা'লা কীভাবে এই মানুষের চিন্তাধারা বদলে দিচ্ছেন।

কিছুদিন আগেও ইউরোপে ইসলামের সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল বহুবিবাহের বিষয়ে। ইউরোপীয়রা দাবি করত যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু এই ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে উৎসাহী হওয়ার পর কিছু মুসলিমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বহুবিবাহ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী। তারা বলল: "না না! এটি ইসলামের শত্রুদের আরোপিত অপবাদ। ইসলাম কোনো নির্দেশ দেয়নি; কেবল বিরল ক্ষেত্রে, কঠোর শর্তে অনুমতি রয়েছে।" তিনি বলেন, এই উত্তর শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: "ইসলামে যে একমাত্র উৎকর্ষ আমি পেয়েছি, তা হলো এই শিক্ষাই-আর আপনারা আমাকে বলছেন এটি অসংখ্য শর্তে সীমাবদ্ধ? আমি সেখানে যাব, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হবে যে ইসলাম সত্যিই এটি অনুমোদন করে।"

এরপর তিনি আমাদের মিশনারিদের কাছে আসেন এবং একই প্রশ্ন করেন। তারা ব্যাখ্যা করেন যে ইসলাম এটি অনুমতি দেয়, তবে ন্যায়বিচার করা এবং প্রতিটি স্ত্রীর হক আদায় করা অপরিহার্য। তিনি উত্তর দিলেন, "এটাই সঠিক, এবং আমার বিবেক

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) বলেন, হে আদী! মুসলমানদের দরিদ্রতা সম্ভবত তোমাকে এ ধর্ম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম! শীঘ্রই এত ধনসম্পদ প্রবাহিত হবে যে, তা নেওয়ার লোক পাওয়া যাবে না। আর সম্ভবত শত্রুর আধিক্যও তোমাকে এ ধর্মে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। [ইসলামের অনেক শত্রু, তাই হয়ত তুমি তা গ্রহণে বিরত থাকছ।] আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তুমি মহিলাদের সম্পর্কে শুনতে পাবে, তারা হীরা (বর্তমান ইসরাঈলে সে সময়কার ত্রিভুজ এক গ্রাম বা শহর) থেকে নিজ উটে চড়ে নির্ভয়ে এই ঘর তথা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করবে। আর সম্ভবত এই বিষয়টিও তোমার এই ধর্ম গ্রহণে বাধ সাধছে যে, রাজত্ব ও ক্ষমতা অন্য লোকদের হাতে রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তুমি ব্যাবিলনের সাদা প্রাসাদগুলো সম্পর্কে শুনতে পাবে যে, এগুলো এদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে কিসরার (তথা পারস্য সম্রাটের) ধনভাণ্ডারও (তাদের জন্য) খুলে দেওয়া হবে। এ কথাটি তিনি (সা.) তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন।

তবুক যুদ্ধের মৌলিক কারণ এটিই জানা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর এবং হুনাইনের যুদ্ধে বনু হাওয়াযিনের মতো শক্তিশালী গোত্রের শোচনীয় পরাজয়ের পর ও আরবের আশপাশের এলাকার সবগুলো গোত্রের ওপর মুসলমানদের বিজয় লাভের পর ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকরা আরো একবার একত্রিত হয় এবং নিজেদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হতে দেখে সেই সময়ের পরাশক্তি রোমান বাদশার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নেয়, আর এর জন্য তারা অনেক বড়ো এবং অনেক ভয়ংকর একটি পরিকল্পনা করে।

রাবোয়া মসজিদে হওয়া সন্ত্রাসী হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ্ তা'লা এসব সরকারকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন এবং জামা'তের পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত নিদর্শন প্রদর্শন করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১০ অক্টোবর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১০ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মক্কা বিজয় শেষে মহানবী (সা.)-এর মদীনায় ফিরে আসার পরও তাঁকে (সা.) কতক অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে, যেগুলোর কথা আমি বর্ণনা করব।

সেগুলোর একটি হলো কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদার অভিযান। এটি সুদা অভিমুখে অষ্টম হিজরী সনে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) যখন জিরানা থেকে মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেন। যেমন তিনি মুহাজের বিন আবু উমাইয়াকে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় এবং যিয়াদ বিন লাবিদকে হাজারামউত অঞ্চলে প্রেরণ করেন আর একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন যার সেনাপতি হিসেবে কায়েস বিন সা'দকে নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) কায়েস বিন সা'দকে চারশ লোকের সাথে পাঠিয়েছিলেন যেন তারা ইয়েমনের সুদা গোত্রের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে পারে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী,মহানবী (সা.) তাদেরকে সুদা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি এই বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেই গোত্রের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি করার সংবাদ এসে থাকবে, যার কারণে তিনি (সা.) এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ যদি এই খবর সঠিক হয় এবং বর্ণ না সঠিক হয়- তাহলে; অবশ্য প্র থম রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) এর জন্য একটি সাদা পতাকা বাঁধেন এবং একটি কালো ঝান্ডা তাদের হাতে তুলে দেন। তারা কানা উপত্যকার একপাশে শিবির স্থাপন করে। কানা উপত্যকা মদীনা এবং উহুদের মধবর্তী মদীনার তিনটি বিখ্যাত উপত্যকার একটি। হযরত কায়েস খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদার পুত্র ছিলেন। হযরত কায়েস বিন সা'দ বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন হযরত সা'দ বিন উবাদার কাছ থেকে পতাকা ফেরত নিয়েছিলেন, তখন তার এই পুত্র কায়েসের হাতেই তা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি সুচিন্তাশীল এবং সাহসী যোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হতেন আর উদারতা ও দানশীলতায়ও বিখ্যাত ছিলেন।

হযরত কায়েস কানা উপত্যকায় শিবিরে অবস্থান করছিলেন, তখন সুদা গোত্রের এক ব্যক্তি যিয়াদ বিন হারেস সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এই ব্যক্তি কিছু সময় পূর্বে মুসলমান হয়েছিল। যখন সে জানতে পারে, এই সেনাবাহিনী তার গোত্রের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তখন সে আক্রমণে বিলম্ব হওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। সে নিশ্চিতভাবে জানত, তার গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চাইত আর তারা এখন সেটিরই প্রতিক্রিয়াস্ব রূপ এসেছে। যাহোক, যখন সে দেখল, তার গোত্রের ওপর আক্রমণ হতে যাচ্ছে, তখন সে সেখান থেকে সরাসরি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে, আপনি যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন সেটিকে ফিরিয়ে আনুন। আমি আমার জাতির জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করছি এবং তাদের ইসলাম গ্রহণেরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অর্থাৎ একটি প্রতিশ্রুতি হলো, তারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করবে না এবং ক্ষতি সাধন করবে না, আর অন্যটি হলো, ধীরে ধীরে তারা ইসলামও গ্রহণ করে নেবে। তিনি (সা.) তার কথা গ্রহণ করে সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নেন। এই ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়, তিনি (সা.) অঞ্চল জয় বা মানুষকে পদানত করার জন্য সেনা পাঠান নি, বরং ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং মুসলিমদের সুরক্ষা ছিল লক্ষ্য। আর যেমনটি হযরত যিয়াদ বিন হারেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা এর ওপর আমলও করেছিল এবং ধীরে ধীরে তার জাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। যদি শুধুমাত্র জোরপূর্বক মুসলিম বানানো উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হতো না। সরাসরি বলা হতো, ইসলাম গ্রহণ করো,নতুবা (তোমাদের জন্য) রয়েছে তরবারি। যাহোক, এর পর তিনি যখন ধীরে ধীরে তবলীগ করেন, তখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কেননা আক্রমণ করা এবং জোরপূর্বক মুসলমান বানানো তো ইসলামী শিক্ষারও পরিপন্থি এবং মহানবী (সা.)-এর নিজের আচরণ ও সুন্নতেরও বিরোধী। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) হযরত যিয়াদকেই তাদের শাসক নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সা.) তার জাতির জন্য একটি নিরাপত্তা স্মারকও লিখিয়ে দিয়েছিলেন।

(শারাহ আল আল্লামা যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮-২৯) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৪৯-৩৫০) (নুরুল ইয়াকিন ফি সীরাত সৈয়্যিদিল মুসলিমীন, পৃ: ২৪৭) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৩৯) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭-৩৮৯]

যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায় তার জন্য নিরাপত্তা স্মারকের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে এটি লেখা হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনও মুসলমান হয় নি।

বনু তামিম অভিমুখে হযরত উয়াইনা বিন হিসন ফাযারীর অভিযানেরও উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে। এই অভিযান হিজরী সনের মুহাররম মাসে বনু তামিম গোত্র অভিমুখে হযরত উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। এর পটভূমি হলো, মহানবী (সা.) হযরত বিশর বিন সুফিয়ানকে খুযাআ গোত্রের বনু কাব শাখার প্রতি যাকাতের অর্থ আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই লোকেরা সুকিয়া এবং বনু তামিম-এর অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করত। তাই হযরত বিশর বিন সুফিয়ানের নির্দেশে বনু খুযাআর সম্পদ চতুর্দিক থেকে তার কাছে সংগৃহীত হতে থাকে। বনু তামিম, যারা তখনও মুসলমান হয় নি, তাদের কাছে এই সম্পদ অনেক বেশি মনে হয় আর তারা বলতে থাকে, এই লোক কেন বিনা অধিকারে আমাদের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে? এবং তারা তাদের তলোয়ার বের করে নেয়। বনু খুযাআ বলে, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং এটি আমাদের ধর্মের নির্দেশ। এই সম্পদ আমরা (স্বেচ্ছায়) দিচ্ছি। তোমাদের এতে কী সমস্যা? কিন্তু বনু তামিম বলে, এই বিশর বিন সুফিয়ান কোনো একটি উটও স্পর্শ করতে পারবে না। এই ঝগড়া এবং যুদ্ধের অবস্থা দেখে হযরত বিশর বিন সুফিয়ান কোনো কিছু সংগ্রহ না করেই সেখান থেকে ফিরে আসেন। এই বিষয়টি বনু খুযাআর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিষয় ছিল। তাদের খুবই খারাপ লেগেছিল। বনু খুযাআ বনু তামিমের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে এই বলে সেখান থেকে বের করে দেয় যে, যদি তোমাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা না থাকত তবে তোমরা তোমাদের শহর পর্যন্ত পোঁছতে পারতে না। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে আমাদের অবশ্যই কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, তোমাদের এই কথা বলা এবং আমাদের যাকাত না দিতে পারার কারণে। তোমরা মহনবী (সা.)-এর প্র তিনিধিকে অগ্রাহ্য করেছ এবং তাকে আমাদের সম্পদের যাকাত নিতে বাধা দিয়েছ।

অপরদিকে হযরত বিশর বিন সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি (সা.) বলেন, এই গোত্রকে কে সমুচিত শিক্ষা দেবে? সবার আগে হযরত উয়াইনা বিন হিসন লাব্বায়েক (আমি হাজির আছি) বলে সাড়া দেন। মহানবী (সা.) হযরত উয়াইনা বিন হিসনকে পঞ্চাশজন আরব অশ্বারোহীসহ বনু তামিমের দিকে প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে মুহাজির এবং আনসারের মধ্য থেকে কেউই ছিল না। উয়াইনা তার সঙ্গীদের সাথে রওয়ানা হন। তারা রাতে সফর করতেন এবং দিনে লুকিয়ে থাকতেন। অবশেষে তারা সেই মরুভূমিতে পোঁছেন যেখানে বনু তামিম অবস্থান করছিল এবং তাদের পশুপাল চরাচ্ছিল। বনু তামিম এই বাহিনীকে দেখে নিজেদের সবকিছু ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাদের এগারোজন পুরুষ, এগারোজন নারী এবং ত্রিশজন শিশু বন্দি হয়েছিল, যাদেরকে তারা মদীনায় নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে হযরত রামলা বিনতে হারেসের ঘরে রাখা হয়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১২)

পরবর্তীতে বনু তামিমের আশি বা নব্বইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। এই প্রতিনিধিদলে তাদের গোত্রের কতক বাগ্মী কবি এবং বক্তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মসজিদে এমন সময় এসেছিল যখন লোকেরা যোহরের নামাযের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর অপেক্ষা করছিল। প্রতিনিধিদল ভেবেছিল যে, সম্ভবত তিনি (সা.) দেরি করেছেন, তাই তাদের মধ্যে কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর কক্ষের কাছে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলতে থাকে যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের বাহিরে আসুন। তিনি (সা.) বাইরে আসেন। তখন এই লোকেরা মহানবী (সা.)-এর সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যোহরের নামায পড়ান এবং নামায শেষ করে মসজিদের প্রাঙ্গণেই বসে পড়েন। প্রতিনিধিদলের নেতা বলে, আমরা কবিতা এবং বক্তৃতায় আপনার সামনে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাই। অর্থাৎ বক্তৃতা এবং কবিতায় আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, যেন জানা যায়- কোন জাতির বক্তা এবং কবি উন্নত মানের। আমরা গর্বিত যে, আমাদের বক্তারাও দক্ষ এবং আমাদের কবিরাও দক্ষ। তিনি (সা.) বলেন, কবিতা এবং বক্তৃতা নিয়ে গর্ব করা আমার আগমনের উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ, আমি এজন্য আসি নি যে, আমার কবিতা এবং বক্তৃতা গর্বের সাথে উপস্থাপন করব। আমার উদ্দেশ্য তো কেবল আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানো। কিন্তু তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করো। অর্থাৎ, যদি তোমরা চাও তাহলে ঠিক আছে, প্রতিযোগিতা করে নাও; আমরা এর উত্তর দেবো। প্রতিনিধিদল তাদের বক্তা উতারেদ বিন হাজেবকে সামনে এগিয়ে দেয়। সে বক্তৃতা করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাসকে এর উত্তর দিতে বলেন। তিনি তার প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সেই ব্যক্তির বক্তৃতার ওপর জয়যুক্ত হয়। (তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪)

হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত সেই সময় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠান। এর পরে প্রতিনিধিদলের কবি যিবরিকান বিন বদর তার কবিতা উপস্থাপন করে। তারপর মহানবী (সা.) হাস্‌সানকে বলেন, তিনি যেন এর মোকাবিলায় নিজের কবিতা শোনান। হযরত হাস্‌সান এর তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান করেন। (সীরাত ইবনে কাসীর, কিতাবুল ওয়াফুদ,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮১)

হযরত হাস্‌সানের শেষ করার পর প্রতিনিধিদলের লোকেরা পরস্পর একসাথে বসে পরামর্শ করে। তখন আকরা বিন হাবিস, যিনি এই প্রতিনিধিদলের সাথে এসেছিলেন, তিনি তার সঙ্গীদের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্তব্য করেন, তাদের বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে ভালো এবং তাদের কবি আমাদের কবির চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের। তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এরপর যখন আলোচনা শেষ হয়, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কতক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আকরা বিন হাবিস কিছু সময় পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন তিনি প্রতিনিধিদলের সাথে পুনরায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) বনু তামিমের ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের বন্দিদের ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং সবাইকে পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে পাঁচশ করে দিরহাম প্রদান করা হয়। (তারিখে তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯০) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৪) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩]

এই প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত উতারেদ বিন হাজেব, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি চাদর উপহার হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। এই চাদরটি তাকে কিসরা দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, এটি খুবই উন্নত মানের একটি রেশমি চাদর ছিল যার ওপর সোনার কারুকাজ করা হয়েছিল। সাহাবীরা চাদরের সূক্ষ্মতা এবং কোমলতা দেখে অত্যন্ত অভিভূত হন এবং এটি নিজেদের হাতের পরশে অনুভবের চেষ্টা করেন। সাহাবীদের এই আচরণ দেখে তিনি (সা.) বলেন, তোমরা এই চাদরের ব্যাপারে এত আশ্চর্য হচ্ছো! জান্নাতে সা'দের চাদরগুলো এর থেকেও অনেক বেশি কোমল এবং অনেক বেশি ভালো।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল হিবা, হাদীস-২৬১৫) (সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৬৩৪৮) (সুনান তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৪৭) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও এই ঘটনার ওপর সার্বিকভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, এক দীর্ঘ সময় পরে যখন তাঁর (সা.) কাছে কোথাও থেকে কিছু রেশমি কাপড় উপহারস্বরূপ আসে, তখন কয়েকজন সাহাবী সেগুলোর কোমলতা এবং মসৃণতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং এটিকে একটি অসাধারণ জিনিস হসেবে জ্ঞান করেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি সেগুলোর কোমলতার ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছ? আল্লাহ্‌র কসম! জান্নাতে সা'দের চাদরগুলো এর থেকে অনেক বেশি কোমল এবং অনেক বেশি ভালো। তাঁর (সা.) এই কথা রূপক ভাষায় ছিল যার মাঝে সা'দের সেই আরামদায়ক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল, যা তিনি জান্নাতে লাভ করেছিলেন। অন্যথায়, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে নীতিগতভাবে জানা যায়, জান্নাতের নিয়ামতসমূহের সাথে এই পৃথিবীর নিয়ামতগুলোর তুলনা করা যায় না। আমাদের পরিভাষানুযায়ী জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পার্থিব বস্তু ও আখ্যায়িত হতে পারে না। আর প্রকৃত বিষয় হলো, যে শব্দগুচ্ছ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে শুধুমাত্র রূপকার্থে এবং তুলনা করতে গিয়ে নিয়ামতসমূহের উৎকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করাই হলো উদ্দেশ্য।"

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

(সীরাত খাতামান্নবীন, পৃ:৬১৪-৬১৫)

এরপর আরেকটি অভিযান হলো কুতবা বিন আমেরের যুদ্ধাভিযান- যা নবম হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত কুতবা বিন আমের (রা.)-কে বিশজন সদস্যসহ খাসাম গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। এক রেওয়ায়েত অনু যায়ী, তাদেরকে কু বালার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ করেছিলেন; ইয়েমেন যাবার পথে তিহামা এলাকায় কুবালা শহর অবস্থিত। মক্কা এবং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আট দিনের যা আনুমানিক ১৫৬ মাইল। এক বর্ণনানুযায়ী, বীশা-র আশপাশের এলাকায় তাদেরকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ করবে। কেননা নিশ্চিতভাবে তারা অরাজকতা সৃষ্টি করছিল। পথিমধ্যে তারা এক ব্যক্তিকে আটক করেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বোবা হওয়ার ভান করে, কিন্তু সে গোত্রের বসবাস স্থলের নিকটবর্তী হতেই চিৎকার করে নিজ গোত্রকে সতর্ক করতে চেষ্টা করে। তার এই ধোঁকাবাজির কারণে তাকে হত্যা করা হয়। যেহেতু তখন গোত্রবাসী কিছুটা সতর্ক হয়ে যায় তাই রাত হওয়ার অপেক্ষা করা হয়। যখন কিছুটা আঁধার নেমে আসে তখন মুসলমানরা তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। তীব্র লড়াই হয় এবং উভয় পক্ষের বহু আহত হয় আর বিরোধী গোত্রের বহু লোক নিহত হয়। হযরত কুতবা (রা.) গনিমতের সম্পদের মাঝে উট, ছাগল এবং নারীদের মদীনায় নিয়ে আসেন। খুমুস পৃথক করার পর তাদের প্রত্যেকের ভাগে চারটি করে উট অথবা চল্লিশটি করে ছাগল আসে।

(মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০-১১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২২৬) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৪)

যাইহোক, নৈরাজ্য দমনের জন্য তাদেরকে এই আক্রমণ করতে হয়েছিল।

এরপর যাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবীর যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ রয়েছে। এটি কিলাব গোত্র অভিমুখে পরিচালিত হয়েছিল। এটি নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত যাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী (রা.)-কে কুরতা এলাকায় তার নিজ গোত্র বনু কিলাব অভিমুখে প্রেরণ করেন। কুরতা হলো বনু বকর গোত্রের একটি শাখা- যা মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত। মুসলমানদের সাথে তাদের নাজদের যুল জালাওয়া নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। তারা (তাদেরকে) ইসলামের বার্তা পৌঁছান; কিন্তু গোত্রবাসী অস্বীকার করে আর বিষয়টি লড়াই পর্য ন্ত গড়ায়। তারা কুরতাবাসীকে পরাজিত করেন আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করেন। এই যুদ্ধাভিযানের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা হলো, সালামা বিন কুরত নামক এক কাফির বিরোধী নেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য তার ছেলে আসয়াদ বিন সালামা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) মুসলমানদের পক্ষে সৈন্যদলের সাথে ছিলেন। শত্রুরা মুসলমানদের আক্রমণের তীব্রতা সইতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের মাঝে হযরত আসয়াদ (রা.)-র পিতা সালামাও ছিল। হযরত আসয়াদ (রা.) তার পিতার পিছু ধাওয়া করেন সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের ঘোড়াসহ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনিও (রা.) তার পিছু পিছু যান আর পিতাকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দেন, যেন যে-কোনো উপায়ে তার পিতা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পিতা প্রত্যুত্তরে পুত্রকে বকঝকা আরম্ভ করে। তিনি যখন দেখলেন তার পিতা ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহী মনোভাবে অটল আছে, তখন পিতার ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দেন আর অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪২৬-৪২৭)

অবশ্য অপর এক বর্ণনানুযায়ী, হযরত আসয়াদ (রা.) যখন মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বৃদ্ধ পিতা তাকে একটি পত্র লেখে। পত্রে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিও ছিল, যার মাঝে সে নিজের বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রের অবাধ্যতার অনুযোগও করে আর পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য তিরস্কারও করে লেখে, কী সেই বিষয়- যার কারণে তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করেছ আর ইসলাম গ্রহণ করেছ? হযরত আসয়াদ (রা.) তার পিতার এই পত্র দেখে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে পিতার (পত্রের) উত্তর প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তিনি তার পিতাকে একটি তবলীগি পত্র লেখেন, যা পড়ে তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বর্ণনাটি আরও বেশি সঠিক বলে মনে হয়। (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৫৪)

এরপর জেদ্দা অভিমুখে হযরত আলকামা বিন মুজাযযিয (রা.)-র অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। ইবনে সা'দ লিখেছেন, এই অভিযান নবম হিজরীর রবিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কিছু বর্ণনানুযায়ী এটি নবম হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, হাবশার কিছু যুদ্ধবাজ ব্যক্তি জেদ্দার সমুদ্র উপকূলে অবস্থান নিয়েছে। কতক বর্ণনানুসারে তারা মক্কাবাসীদের এলাকায় ডাকাতি করতে চেয়েছিল। একটি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তারা সমুদ্র অতিক্রম করে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল। জেদ্দা মক্কা মুকাররমার পশ্চিম উপকূলীয় একটি শহর, যা আজও বিদ্যমান এবং এটি হেজাযের একটি বড়ো শহর। মক্কা থেকে জেদ্দার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার, আর মদীনা থেকে জেদ্দার দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল।

মহানবী (সা.) হযরত আলকামা (রা.)-কে তিনশ লোকের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের প্রতি প্রেরণ করেন। হাবশার যে-সকল লোক জেদ্দার সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করেছিল, তারা হযরত আলকামা (রা.)-র আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজেদের নৌকায় চড়ে সমুদ্রে পলায়ন করে। হযরত আলকামা (রা.) একটি দ্বীপ পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করেন।এই অভিযানের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে:হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আলকামা বিন মুজাযযিয (রা.)-কে একটি সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং আমিও সেই সৈন্যদলে ছিলাম। আমরা যখন আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাই এবং অভিযান শেষে যখন একটি দল দ্রুত ফিরে আসার জন্য তাদের আমীরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাদের অনুমতি প্রদান করেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফাহ সাহমী (রা.)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তার প্রকৃতিতে রসিকতা করার অভ্যাস ছিল। তারা পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি দেয়। এরপর তারা আগুন পোহানোর উদ্দেশ্যে আগুন প্রজ্বলিত করে। সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ সাহমী (রা.) তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের ওপর কি আমার এই অধিকার নেই যে, তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে? তারা বলেন, অবশ্যই, কেন নয়? তিনি বলেন, আমি তোমাদের যে আদেশ দেবো, তোমরা কি তা পালন করবে? তারা বলেন, হ্যাঁ (অবশ্যই)। তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি- তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দাও। কিছু লোক উঠে দাঁড়ায় এবং ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি এটি অনুধাবনে করতে পারেন যে, তারা সত্যিই ঝাঁপ দেবেন, তখন তিনি তাদের বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও; আমি তো তোমাদের সাথে কেবল রসিকতা করছিলাম। ফিরে এসে তারা মহানবী (সা.)-কে এই ঘটনার উল্লেখ করলে মহানবী (সা.) বলেন, مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَلَا تُطِيعُوهُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার আদেশ দেয়, তার আনুগত্য কোরো না।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার বিষয়ে কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য তো কেবল সৎ ও ন্যায়সংগত কাজে নিহিত। [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪২৬-৪২৭] (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৬) (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জিহাদ , হাদীস-২৮৬৩)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন এই ঘটনা মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اَلطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ অর্থাৎ যদি তারা তাতে (তথা আগুনে) প্রবেশ করত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের হতে পারত না। কেননা আনুগত্য তো কেবল সৎ ও ন্যায়সংগত কাজে নিহিত। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৪০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, শরীয়ত পরিপন্থি বিষয়গুলোতে আনুগত্য করতে হয় না। মহানবী (সা.) একবার এক সাহাবীকে একটি ছোটো সৈন্যদলের সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তিনি কোনো একটি বিষয়ের আদেশ দিলে কতিপয় সাহাবী আমল

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

করেন নি। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হন এবং বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করেছেন এবং তিনি (সা.) এ-ও বলেছেন, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করবে সে আমার আনুগত্য করবে, আর যে তার অবাধ্যতা করবে সে আমার অবাধ্যতা করবে। আমি যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্র তিনিধি হিসেবে রয়েছি, সেক্ষেত্রে কেন তোমরা আমার অবাধ্যতা করলে? এতে সাহাবীরা বলেন, আমরা আপনার আনুগত্য করব। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি দেখতে চাই তোমরা আনুগত্য করো কি-না। এরপর তিনি আগুন প্রজ্বলিত করার নির্দেশ দেন। যখন আগুন জ্বলে ওঠে তখন তিনি সাহাবীদের বলেন, এতে ঝাঁপ দাও। কেউ কেউ তো প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু অন্যরা তাদেরকে বিরত রাখেন এবং বলেন, শরীয়তসম্মত বিষয়ে আনুগত্য হয়ে থাকে, এরা শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। এভাবে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা অবৈধ। আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, আত্মহত্যা করা অনুচিত। যখন এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি (সা.) তাদের পক্ষে মত দেন যারা বলেছিলেন, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া অবৈধ।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৬০-২৬১)

এরপর হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে বনু তাঈ গোত্রের ফুল্‌স অভিমুখে যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি নবম হিজরী সনের রবিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। ফুল্‌স ছিল নাজদ অঞ্চলের একটি প্রতিমা এবং তাঈ গোত্র এর উপাসনা করত। এর নামে উপহারউপঢৌকন উৎসর্গ করার পাশাপাশি অস্ত্রও উৎসর্গ করত। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেড়শ আনসারসহ বনু তাঈ-এর প্রতিমা ফুল্‌স ধ্বংস করার জন্য এই অভিযানে প্রেরণ করেন। তাদের কাছে একশ উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া ছিল। এই সেনাদলের বিশেষত্ব ছিল, হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অন্যান্য সকল সদস্য ছিলেন আনসার; মুহাজির বা অন্যদের মধ্য থেকে কেউ ছিলেন না। বনু তাঈ আরবের বিখ্যাত একটি গোত্র ছিল। এরা সিরিয়ার নিকটে বসবাস করত। তিনি (সা.) এই যুদ্ধাভিযানের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে একটি কালো রঙের বড়ো পতাকা এবং সাদা রঙের একটি ছোটো পতাকা প্রদান করেন। হযরত আলী (রা.) ভোরবেলা আক্রমণ করেন এবং তাদের প্রতিমা ফুল্‌স ধ্বংস করেন। অসংখ্য বন্দি , সম্পদ ও গবাদিপশু হস্তগত হয়। এটি বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর গোত্র ছিল এবং বন্দিদের মাঝে হাতেম তাঈএর মেয়ে সাফানাও ছিল। হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী- যে গোত্রের নেতা ছিল- সে পালিয়ে যায় এবং সিরিয়া অভিমুখে পলায়ন করে। হযরত আবু কাতাদাকে (রা.) বন্দিদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সম্পদ ও গবাদি পশুর দায়িত্ব দেওয়া হয় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আতীককে (রা.)। মহানবী (সা.)-এর জন্য খুমুস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হয়। তবে হাতেম তাঈ-এর কন্যা সাফানাকে তারা বণ্টন করেন নি; তাকে গ্রেফতার করে মদীনাতে নিয়ে আসেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৫] (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৬৪)

হাতেম তাঈ-এর কন্যা সাফানাকে অন্যান্য বন্দিদের সাথে মসজিদে নববীর দরজার পাশে একটি তাঁবুতে রাখা হয়। সাফানা খুব সাহসী ও বুদ্ধিমতী নারী ছিল। যখন মহানবী (সা.) তার তাঁবুর পাশ দিয়ে যান তখন সে মহানবী (সা.)-এর সম্মানে দাঁড়িয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ভাই পালিয়ে গিয়েছে, যে আমার একমাত্র অভিভাবক ছিল। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করবেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, অভিভাবককে ছিল? সে বলে, আদী বিন হাতেম তাঈ। তিনি (সা.) বলেন, সেইব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে পালিয়ে গেছে? এই কথা বলে তিনি (সা.) সেখান থেকে চলে যান। পরের দিন যখন তিনি (সা.) সে স্থান অতিক্রম করছিলেন তখন সাফানা আগের দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তিনি (সা.) তাকে আগের দিনের উত্তর দিয়ে চলে যান আর সে হতাশ হয়ে যায়। তৃতীয় দিন মহানবী (সা.) যখন সেই তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর (সা.) পেছন পেছন হযরত আলী (রা.)-ও আসছিলেন। হযরত আলী (রা.) সাফানাকে ইশারা করেন যেন সে নিজের দাবি উপস্থাপন করে। সে তৎক্ষণাৎ সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে পুনরায় নিজের সেই আবেদন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে। এতে তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমার আবেদন গ্রহণ করছি, তুমি এখন স্বাধীন। কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে তাড়াহুড়ো করবে না। যখন কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাওয়া যাবে, তখন তোমাকে তার সাথে তোমার ভাইয়ের কাছে সিরিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এক বর্ণনানুযায়ী সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে তার প্রতি অনুগ্রহ করার আবেদন জানায়, অর্থাৎ তিনি যেন তাকে স্বাধীন করে দেন। এতে তিনি (সা.) তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এর ফলে সে মুসলমান হয়ে যায়। কয়েক দিন পর বনু কুযাআর কতিপয় লোক মদীনায় আসে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া যাওয়া। সাফানা তা অবগত হলে মহানবী (সা.)-এর নিকট আবেদন করে, এই লোকদের প্রতি তার আস্থা আছে, তাই তাকে তাদের সঙ্গে সিরিয়ায় যেতে দেওয়া হোক। মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দেন এবং তার জন্য কিছু কাপড়, বাহন এবং পাথেয় প্রদান করেন। সেখানে থেকে বিদায় নিয়ে সে সিরিয়ায় নিজের ভাই আদীর কাছে পৌঁছায়।

সে যখন সেখানে পৌঁছে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তখন তাকে কটাক্ষ করে বলে, তুমি তোমার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসলে, আর তোমার বোন ও নিজের মানমর্যাদা সেখানেই জলাঞ্জলি দিয়ে আসলে? একথা শুনে ভাই ক্ষমা চায় ও লজ্জিত হয়। স্বল্পকাল পর আদী তার বোনকে জিজ্ঞাসা করে, এখন বলো তো, মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? সাফানা- যে মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্র দেখে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল- সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মতে, যত দ্রুত সম্ভব তুমি তাঁর (সা.) কাছে চলে যাও। তিনি যদি সত্যিই নবী হন, তাহলে তাঁর কাছে যে ব্যক্তি দ্রুত যাবে সে-ই সফলকাম হবে; আর যদি তিনি কোনো বাদশা হন তাহলেও তোমার সম্মান-সম্ভ্রমে কোনো ক্ষতি হবে না। আদী বলে, এটা খুব ভালো পরামর্শ। এরপর সে দ্রুত রওয়ানা হয়ে মদীনায় পৌঁছে যায়। মহানবী (সা.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আদী নিজের পরিচয় দেয়। মহানবী (সা.) তাকে সাথে করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। পথে এক বৃদ্ধা আলাপচারিতার উদ্দেশ্যে কিংবা কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য মহানবী (সা.)-কে থামায়। মহানবী (সা.) সেই বৃদ্ধা মহিলার সাথে কথা বলার জন্য দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। আদী এটা দেখে মনে মনে ভাবে, এই ব্যক্তি তো রাজাবাদশা হতে পারেন না, যিনি এভাবে এক বৃদ্ধার কথায় থেমে গিয়েছেন। বাড়ি পৌঁছার পর মহানবী (সা.) যখন খেজুরের পাতা ভরা চামড়ার একটি গদি তাকে বসার জন্য দেন, তখন আদী নিবেদন করে, আপনি এর ওপর বসুন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, না, তুমি এর ওপর বসো; আর তিনি (সা.) নিজে মাটিতে বসে যান। এ দৃশ্য দেখে আদী আবারও ভাবে, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় এ ব্যক্তি কোনো রাজা নন। এরপর মহানবী (সা.) তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। তার ধর্ম ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে কিছু কথা বলেন যেগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় এমন ছিল, যা আদী ছাড়া আর কেউ জানত না। এসব শুনে আদীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, তিনি সত্যিই রসূল। সে নিবেদন করে, আমি নিশ্চিত হলাম- আপনি সত্যই আল্লাহ্‌র রসূল;কারণ আপনাকে কিছু গোপন বিষয়েরও সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, হে আদী! ইসলাম গ্রহণ করো; তুমি নিরাপদ থাকবে। আমি বললাম, আমি ইতোমধ্যে একটি ধর্মের অনুসারী। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমার চেয়ে ভালো জানি। আমি বললাম, আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন? এটি কীভাবে হতে পারে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমার চেয়ে বেশি জানি। এরপর মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি রুকুসী অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম এবং সাবী ধর্ম- এই দুইয়ের মাঝামাঝি বিশ্বাসে বিশ্বাসী নও? আমি বললাম, অবশ্যই। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার গোত্রের সর্দার নও? আমি বললাম, হ্যাঁ। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি সর্দার হবার কারণে গনিমতের এক-চতুর্থাংশ ধনসম্পদ নাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি নিয়ে থাকি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের ধর্ম অনুযায়ী এভাবে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। একথা শুনে আমি ভীষণ লজ্জা ও অপমান অনুভব করলাম। তারপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আদী! মুসলমানদের দরিদ্রতা সম্ভবত তোমাকে এ ধর্ম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম! শীঘ্রই এত ধনসম্পদ প্রবাহিত হবে যে, তা নেওয়ার লোক পাওয়া যাবে না। আর সম্ভবত শত্রুর আধিক্যও তোমাকে এ ধর্মে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। [ইসলামের অনেক শত্রু, তাই হয়ত তুমি তা গ্রহণে বিরত থাকছ।] আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তুমি মহিলাদের সম্পর্কে শুনতে পাবে, তারা হীরা (বর্তমান ইসরাঈলে সে সময়কার ত্রিভুজ এক গ্রাম বা শহর) থেকে নিজ উটে চড়ে নির্ভয়ে এই ঘর তথা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করবে। আর সম্ভবত এই বিষয়টিও তোমার এই ধর্ম গ্রহণে বাধ সাধছে যে, রাজত্ব ও ক্ষমতা অন্য

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

লোকদের হাতে রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তুমি ব্যাবিলনের সাদা প্রাসাদগুলো সম্পর্কে শুনতে পাবে যে, এগুলো এদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে কিসরার (তথা পারস্য সম্রাটের) ধনভাণ্ডারও (তাদের জন্য) খুলে দেওয়া হবে। এ কথাটি তিনি (সা.) তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন।

আদী বলেন, মহানবী (সা.)-এর উত্তম আচরণ ও এসব বিষয় দেখে আমি মুসলমান হয়ে যাই। হযরত আদী (রা.) তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি এ-ও বলতেন, আমি মুসাফির মহিলাদের দেখেছি, যারা সঙ্গীহীন অবস্থায় হীরা থেকে যাত্রা করে বাইতু ল্লাহ্‌ তাওয়াফের জন্য আগমন করেছে। কিসরা বিজয়ী সেনাদলে আমিও ছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আদী (রা.) ইসলামের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করতেন। নামাযের জন্য সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকতেন। নামায পড়ার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও সজাগ থাকতেন।

যে-সব মানুষ বার বার প্রশ্ন করে, হজ্জের সময় মাহরাম (পুরুষ) আত্মীয়ের সাথে যাওয়া আবশ্যক কি-না; এ বিষয়ে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা আবশ্যক ছিল, সে সম্পর্কে আমি কয়েকবার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু এই ঘটনাটিও সেই কথা সমর্থন করে যে; হযরত আদী (রা.) বলেন, আমি নিজে দেখেছি- জনৈক মহিলা হীরা থেকে একা কা'বা তাওয়াফ করতে এসেছেন, তার সাথে আর কেউ ছিল না। অর্থাৎ মাহরাম আত্মীয় থাকার কোনো শর্ত ছিল না। হযরত আলী (রা.)-র এ অভিযানের কিছু সময় পর তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

(আসসীরাতুন নববিয়া লি ইবনে হিশাম,পৃ: ৮৫৩-৮৫৪) ((আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৬) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৫৯৫) (তারিখুত তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৭-১৮৮) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৪২)

এরপর উকাশা বিন মিহসান (রা.)-র অভিযানের কথা উল্লেখ করছি যা 'জানাব'অভিমুখে হয়েছিল। এ অভিযানটি নবম হিজরীর রবিউস সানী মাসে হয়েছিল। হযরত উকাশার এ অভিযানটি মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত 'উযরা' ও 'বালি' গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়েছিল যারা 'জিনাব'-এর আশপাশে বসবাস করত। কিছু বর্ণনায় এ স্থানের নাম 'জিবাব'-ও বর্ণিত হয়েছে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২২০) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৯৭)

বিস্তারিতভাবে এ অভিযান সম্পর্কে বর্ণিত হয় নি। কেবল এতটুকু জানা যায় যে, এ অভিযানটি হয়েছিল।

(আসসীরাতুন নববিয়া আহমদ বিন যাইনি দাহলান, পৃ: ১২৩)

এখন তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা বর্ণনা করে দিই। নবম হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এটি হয়েছিল। তায়েফের যুদ্ধের পর নবম হিজরীর রজব মাসে মহনবী (সা.) এ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এটি মহানবী (সা.) -এর জীবনের শেষ যুদ্ধ ছিল। তাবুক মদীনা থেকে প্রায় ৬৮৫ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

তাবুক নামের ঝরনার নিকট অবস্থান করার কারণে এ যুদ্ধকে তাবুকের যুদ্ধ বলা হয়। মহানবী (সা.) তাবুকের কাছে পৌঁছানোর পর কাফেলার সদস্যদের বলেন, إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ অর্থাৎ আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্‌ তোমরা তাবুকের ঝরনায় পৌঁছাবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, হাদীস-৭০৬)

পবিত্র কুরআনে তাবুকের যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে 'সাআতুল উসর' অর্থাৎ কষ্টের সময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এ যুদ্ধকে গাযওয়াতুল উসর-ও বলা হয়। (সহীহ বুখারী, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০০)

কারণ এ যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক প্রতিবন্ধকতা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেমন- প্রচণ্ড গরম, দূরের সফর, বাহনের অনেক ঘাটতি এবং পথিমধ্যে পানির প্রবল সংকট ছিল; সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য অর্থেরও অভাব ছিল এবং এসব সমস্যার বেশ সম্মুখীন হতে হয়। এসব কষ্টের কারণে এটিকে 'জায়শুল উসরা'-ও বলা হয়, অর্থাৎ অভাব ও কষ্ট-কবলিত সেনাদল। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪১৫)

এ যুদ্ধকে 'গাযওয়াতুল ফাযিহা'-ও বলা হয়। আরবী ভাষায় 'ফাযাহাত' শব্দের অর্থ হলো অপমান ও পর্দা উন্মোচন করা। যেহেতু এ যুদ্ধের কারণে অনেক মুনাফিকের চেহারা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যা তাদেরঅধিক লাঞ্ছনা ও সম্মান খর্ব হবার কারণ হয়েছে- এজন্য এর এই নাম দেওয়া হয়েছে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

তাবুক যুদ্ধের কারণসমূহ এবং প্রেক্ষাপট কী ছিল? এমনিতে তো মদীনাবাসীদের জন্য সর্বদাই বহিঃশত্রুদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে রোমানদের সমর্থনপুষ্ট বনু গাস্‌সানের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকত আর এমন সংবাদও ছিল যে, রোমান ও গাস্‌সানি- উভয়ই কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। গাস্‌সানিদের আক্রমণের আশঙ্কা এবং ভীতি সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন, গাস্‌সানিদের পক্ষ থেকে সর্বদাই আমাদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকত; অর্থাৎ সর্বদা এই ভীতি থাকত- এই বুঝি আক্রমণ হবে। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭) (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৯১৩)

তাবুক যুদ্ধের তাৎক্ষণিক যে কারণ ছিল সে সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে, ব্যবসায়ীদের একটি দল যারা সিরিয়া থেকে মদীনায় জলপাইয়ের তেল নিয়ে এসেছিল- তারা মুসলমানদেরকে বলে,রোমানরা সিরিয়ায় অনেক বড়ো একটি সৈন্যবাহিনী একত্রিত করেছে এবং হিরাক্লিয়াস সেই সৈন্যবাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে এক বছরের খরচ সরবরাহ করেছে। তাদের সাথে লাখাম, জুযাম, আমেলাহ্‌, গাস্‌সান ও অন্যান্য খ্রিষ্টান গোত্রগুলো যুক্ত হয়েছে এবং তাদের অগ্রগামী বাহিনী বালকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বালকা হচ্ছে সিরিয়ায় অবস্থিত একটি এলাকা যা দামেস্ক এবং ওয়াদিউল কুরার মাঝে অবস্থিত। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৩) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮০)

এই যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ এটিও ছিল যার উল্লেখ একটি বর্ণনাতে পাওয়া যায়; তা এমন যে, আরবের খ্রিষ্টানরা হিরাক্লিয়াসের কাছে লেখে, যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবি করেছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)- তিনি মারা গেছেন (নাউযুবিল্লাহ্‌) আর তার সাথিরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছে এবং তাদের সম্পদ ও পশুপাল ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনই তাদের ওপরআক্রমণ করার ও খ্রিষ্টধর্মকে বিজয়ী করার এক মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং সে তার সেনাপ্রধানকে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করে; সেই সেনাপ্রধানের নাম ছিল কাবায বা যান্নাদ। মহানবী (সা.) যখন এই সেনাদলের সংবাদ প্রাপ্ত হন তখন মহানবী (সা.)-ও সেনাদল প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। (শারাহ আল্লামা যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৮)

এই যুদ্ধের মৌলিক কারণ এটিই জানা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর এবং হুনাইনের যুদ্ধে বনু হাওয়াযিনের মতো শক্তিশালী গোত্রের শোচনীয় পরাজয়ের পর ও আরবের আশপাশের এলাকার সবগুলো গোত্রের ওপর মুসলমানদের বিজয় লাভের পর ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকরা আরো একবার একত্রিত হয় এবং নিজেদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হতে দেখে সেই সময়ের পরাশক্তি রোমান বাদশার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নেয়, আর এর জন্য তারা অনেক বড়ো এবং অনেক ভয়ংকর একটি পরিকল্পনা করে।

একদিকে তারা রোমান বাদশার সাথে যোগাযোগ করে ও তাকে প্রস্তুত করে যেন সে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে, যেন মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়। আর অপরদিকে মুনাফিকরা এমনটি করে যে, তারা মদীনায় পূর্ব থেকেই এই গুজব ছড়াতে শুরু করে- রোমান বাদশা তার সেনাদল প্রেরণ করছে যা মদীনায় মুহাম্মদ (সা.) -সহ সকল মুসলমানকে হত্যা করবে। এভাবে মুনাফিকরা এবং অন্য বিরোধীরা এটি চাচ্ছিল, খুব সম্ভব মহানবী (সা.) নিজেই এই সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য মদীনা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন, এবং উভয় পরিস্থিতিতেই- তা যাত্রার কাঠিন্যই হোক কিংবা রোমান বাদশার মোকাবিলাই হোক- মুসলমানদের এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু নিশ্চিত করে ছাড়বে, (নাউযুবিল্লাহ্‌)।

যাইহোক, এটিই ছিল তাদের আকাঙ্ক্ষা। এর আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীতে বর্ণনা করব।

আজ রাবওয়ার গোলবাজারে অবস্থিত মসজিদুল মাহ্‌দীতে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে এবং সেখানে আমাদের পাঁচ-ছয়জন ব্যক্তি আহত হয়। দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাদের অপারেশনও চলছিল। আল্লাহ্‌ করুন, তাদের অবস্থা যেন ভালো হয়ে যায়; অন্য আহতদের ওপরও আল্লাহ্‌ তা'লা অনুগ্রহ করুন। কয়েকজন যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের পেটে গুলি লেগেছে। আক্রমণকারী এক সন্ত্রাসীকেও আমাদের নিরাপত্তারক্ষীরা হত্যা করেছে; আরেকজন পালিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট এটুকুই, বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে।

আল্লাহ্‌তা'লা এই সন্ত্রাসীদের, আইন ভঙ্গকারীদের এবং জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের অচিরেই ধৃত করুন।

পাঞ্জাব সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং পাঞ্জাব সরকার এই দাবি করেছে যে, পাঞ্জাবের মধ্যে অপরাধ শতভাগ নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে এবং এখন আর কোনো অপরাধী নেই। কিন্তু আহমদীদের ওপর প্রতিনিয়ত যে-সব আক্রমণ হচ্ছে, হত্যা ও শহীদ করা হচ্ছে অথবা আহত করা হচ্ছে এবং তাদের সহায়সম্পদে আগুন লাগানো হচ্ছে-এগুলোকে তারা হয়ত অপরাধই মনে করে না! আল্লাহ্‌ তা'লা এসব সরকারকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন এবং জামা'তের পক্ষে আল্লাহ্‌ তা'লা অতি দ্রুত নিদর্শন প্রদর্শন করুন।

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল,৩১ অক্টোবর, ২০২৫)

****

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছ, নাকি রাখো নি? তিনি (রা.) উত্তর দেন, পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি।

হযরত উসমান (রা.) সে সময় দশ হাজার দিনার প্রদান করেছিলেন আর তখন তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-র জন্য এই দোয়া করেছিলেন,

غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يُبَالِي مَا عَمِلَ بَعْدَهَا

অর্থাৎ হে উসমান! আল্লাহ্ তা'লা তোমার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন, যা তুমি গোপনে করেছ এবং যা তুমি প্রকাশ্যে করেছ এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। এরপর সে যা কিছুই করবে তার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

এটি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করে। আমি প্রায় সময়ই ঘটনাবলি উল্লেখ করে থাকি; এমন অনেকেই আছেন, যারা নিজেদের যা কিছু আছে– সবই আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেন। ধনীদের, বিত্তবানদের হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-র দৃষ্টান্ত সামনে রেখে নিজেদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করা উচিত।

রাবোয়ার ঘটনায় আহতদের জন্য দোয়ার আহ্বান। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন; ভবিষ্যতেও প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে, প্রত্যেক ক্ষতি থেকে, প্রতিটি স্থানে জামা'তের সদস্যদের রক্ষা করুন।

তবুকের যুদ্ধের বিবরণ ও মহানবী (সা.).-এর আদর্শ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১৭ অক্টোবর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১৭ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পূর্ববর্তী খুতবায় যেমনটি তাবুক যুদ্ধের বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল, আজ তার আরো বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই যুদ্ধ, অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:রসূলু ল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা জয় করেন, তখন আবু আমের মাদানী, যে খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে মেলামেশার কারণে যিকির-ওয়াযিফা করার অভ্যাস ছিল, যে কারণে লোকেরা তাকে 'রাহেব' (সন্ন্যাসী) বলত, কিন্তু ধর্মের দিক থেকে সে খ্রিষ্টান ছিল না; এই ব্যক্তি রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর মদীনায় পৌঁছার পর মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। যখন মক্কাও বিজিত হয় তখন সে ভাবতে থাকে, এখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য আমার অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা উচিত। অবশেষে সে তার নাম ও ধরন বদলে মদীনার কাছে 'কুবা' নামক গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করে। বছরের পর বছর বাইরে থাকার কারণে এবং চেহারা ও পোশাক কিছুটা পরিবর্তন করে নেবার ফলে মদীনার সাধারণ লোকজন তাকে চিনত না। কেবল সেই মুনাফিকরাই তাকে চিনত যাদের সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সে মদীনার মুনাফিকদের সাথে মিলে এই পরিকল্পনা করে যে, আমি সিরিয়ায় গিয়ে খ্রিষ্টান সরকার এবং আরব খ্রিষ্টান গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করব এবং তাদেরকে মদীনায় আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করব। এদিকে তোমরা এই গুজব ছড়ানো শুরু করে দাও যে, সিরীয় বাহিনী মদীনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ যারা মদীনার মুনাফিক, তারা যেন এই প্রচার শুরু করে দেয়। যদি আমার এই কৌশল সফল হয় তাহলে তো এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হবেই, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হবে; আর যদি আমার কৌশল সফল না হয়, তাহলে এসব গুজবের কারণে মুসলমানরা হয়ত সিরিয়ায় গিয়ে নিজেরাই আক্রমণ করে বসবে এবং এভাবে রোমান সরকার ও তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে আর আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এই ফিতনা সৃষ্টিকারী বলে, উভয় পরিস্থিতিতেই আমাদের লাভ। সে অনু যায়ী এই উসকানি দিয়ে এ ব্যক্তি সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং মদীনার মুনাফিকরা প্রতিদিন মদীনায় এই খবর ছড়াতে আরম্ভ করে যে, অমুক কাফেলার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল এবং তারা জানিয়েছে, সিরীয় সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরের দিন আবার বলত, অমুক কাফেলার লোকেরা আমাদের সাথে দেখা করেছে এবং তারা বলেছে, সিরীয় সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণ করতে আসছে। এসব সংবাদ এত ব্যাপক হারে ছড়াতে থাকে যে, মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনী নিয়ে নিজেই সিরীয় বাহিনীর মোকাবেলা করতে যাওয়া সমীচীন মনে করেন। এই সময়টা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের সময় ছিল। এটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর, বিগত মৌসুমে শস্য ও ফল কম উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই মৌসুমের ফসল তখনও পরিপক্ক হয় নি, অর্থাৎ ফসল তখনও কাটা হয় নি। সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথম দিকে তিনি (সা.) এই অভিযানের জন্য রওয়ানা হন। মুনাফিকরা আগেই জানত, এর পুরোটাই দুষ্টামি এবং তারা এই সমস্ত চালাকি এই কারণে করেছে যে, যদি সিরীয় বাহিনী আক্রমণ না করে তবে মুসলমানরা নিজেরাই সিরীয়দের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করবে এবং এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। মুতার যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের সামনে ছিল, সেই সময় মুসলমানদেরকে এত বড়ো সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়েছিল যে, তারা অনেক ক্ষতি স্বীকার করে কোনোমতে বেঁচে ফিরেছিল। এখন তারা নিজেদের চোখে আরেকটি মুতার দৃশ্য দেখতে চেয়েছিল, যেখানে তাদের ধারণা মতে স্বয়ং মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে যাবেন, (নাউযুবিল্লাহ্)। এ কারণে একদিকে মুনাফিকরা প্রতিদিন এই খবর ছড়াত যে, অমুক সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি– শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে, অমুক সূত্র থেকে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

জানতে পেরেছি– সিরীয় বাহিনী আসছে; আর অন্যদিকে তারা লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছিল যে, এত বড়ো সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা সহজ নয়। তোমাদের যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। এসব কর্মকাণ্ড দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা সিরিয়া আক্রমণ করতে গেলেও যেন যতটা সম্ভব কম সংখ্যায় যায়, যেন তাদের পরাজয় আরো বেশি নিশ্চিত হয়। (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড–২০, পৃ: ৩৫৯–৩৬০)

অর্থাৎ কম সংখ্যক হলে পরাজয় নিশ্চিত হবে। যাইহোক, আগত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, যদি তিনি রোমানদের সাথে মোকাবিলা করতে বিলম্ব করেন বা তাদেরকে মুসলমানদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে প্রবেশ করার সুযোগ দেন, তবে এর ক্ষতি বেশি হবে। এই কারণে তিনি কষ্ট ও কাঠিন্য সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেন, রোমানদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগ না দিয়ে স্বয়ং তাদের এলাকায় গিয়েই তাদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ করা হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ অন্যত্র এই বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

মহানবী (সা.)–এর কাছে এসব গুজব পৌঁছলে তিনি এই নির্দেশ দেন যে, রোমানরা আমাদের ওপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করার পরিবর্তে আমাদের উচিত সীমান্তে গিয়েই তাদেরকে প্রতিরোধ করা। তিনি মুসলমানদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড=২২, পৃ: ১৩৫)

[প্রথম একটি উদ্ধৃতি আমি একটি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে দিয়েছিলাম। এই অংশটুকু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)– এর।] যাহোক, মহানবী (সা.) সাধারণত যুদ্ধাভিযানগুলো কিছুটা গোপন রাখতেন। কিন্তু খায়বারের অভিযানের পর তাবুকের অভিযান এমন ছিল যে, তিনি (সা.) সাধারণ ঘোষণা করেন এবং পথের অসুবিধা ও শত্রুর আধিক্যের কথা আগে থেকে জানিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীষ–২৯৪৮)

এই বর্ণনা বুখারীতে এসেছে। একই সাথে তিনি (সা.) মক্কা এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোতে লোক পাঠান যেন তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। অন্যদিকে তিনি (সা.) ধনী ব্যক্তিদেরকে জোর দিয়ে বলেন, তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে তাদের সম্পদ খরচ করে। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

মহানবী (সা.) বিভিন্ন গোত্রকে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার বার্তা পাঠান এবং তাদের কাছে নিজের দূত প্রেরণ করেন, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বুরাইদা বিন হুসাইবকে বনু আসলাম গোত্রের প্রতি, হযরত আবু রুহম গিফারীকে তার গোত্র বনু গিফারের প্রতি, হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসীকে তার গোত্র বনু লাইসের প্রতি, হযরত আবু জা'দ যামরীকে তার গোত্রের প্রতি প্রেরণ করেন। হযরত রাফে বিন মাকীসকে জুহাইনার প্রতি পাঠান। একইভাবে হযরত নুয়াইম বিন মাসউদকে আশজাআ' এবং বুদাইল বিন ওয়ারাকা, আমর বিন সালিম ও বুসর বিন সুফিয়ানকে বনু কা'ব ও বনু আমর–এর প্রতি প্রেরণ করেন এবং একইভাবে আব্বাস বিন মিরদাসকে বনু সুলাইমের প্রতি রওয়ানা করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৫) (আমতাউল আসমা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭)

মদীনায় সেই সময় এক কঠোর ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ ছিল এবং এর কারণ এটি ছিল যে, শক্তিশালী শত্রু যেকোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। বস্তুত বুখারীর এক বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত উমর বর্ণনা করেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম যে, একজন গাসসানি রাজা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য তার ঘোড়াগুলোর পায়ে নালও পরিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। আর বুখারীরই একটি রেওয়ায়েতে হযরত উমরের বর্ণনা রয়েছে যে, আমরা এক গাসসানি রাজার ভয়ে ছিলাম। আমাদেরকে জানানো হয়েছিল, সে আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরিবেশে আমাদের মন ভীত ছিল।

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাজাব, হাদীস–২৪৬৮)

যাইহোক, তা সত্ত্বেও সাহাবীদের প্রস্তুতি এবং আর্থিক ত্যাগের যে ঈমানদীপ্ত প্রদর্শনী দেখা গিয়েছিল, তা–ও দেখার মতো ছিল। এর বিবরণে লেখা আছে, এই ভয় ও আতঙ্কের পাশাপাশি মদীনা সেই সময় কঠোর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন ছিল এবং ফসল ও ফল পাকার অপেক্ষায় ছিল। এই দুর্ভিক্ষের মাঝে লোকেরা তাদের ফসল তোলার চিন্তা ও প্রস্তুতিতে থাকার সময় জিহাদের জন্য বের হবার ঘোষণা আসে। এছাড়া প্রবল গরম, শত শত মাইলের দীর্ঘ সফর এবং খাদ্য ও রসদের ঘাটতি– এসব তো ছিলই। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও যখন রসূলু ল্লাহ্ (সা.) জিহাদের আহ্বান জানালেন, তখন ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ সাহাবীরা নিজেদের পাকা ফসল ও ফল রেখে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন। যদিও নিষ্ঠাবান কিন্তু দরিদ্র সাহাবীদের জন্য এমন দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া সহজ ছিল না এবং মহানবী (সা.) এসব কষ্ট–কাঠিন্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি (সা.) ধনীদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দান করার এবং যানবাহন সরবরাহ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি (সা.) বলেন, مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাইশুল উসরা তথা তাবু ককে সামগ্রীসহ প্রস্তুত করবে, সে জান্নাত লাভ করবে।

(বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস–২৭৭৮)

এই আহ্বানের পর প্রথম যিনি ধনসম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। তিনি (রা.) নিজের ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)–কে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তোমার পরিবার–পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছ, নাকি রাখো নি? তিনি (রা.) উত্তর দেন, পরিবার–পরিজনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)–কে রেখে এসেছি।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত উমর (রা.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে দান করতে বলেন। তখন আমার কাছে কিছু সম্পদ ছিল এবং আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি কখনো যদি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারি তবে তা আজই সম্ভব; আজ হয়ত আমি আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে পারব। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখেছ? আমি বললাম, যতটা এনেছি ঠিক ততটাই রেখে এসেছি। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর (রা.) তার কাছে যা ছিল সব কিছু নিয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তুমি নিজ পরিবার–পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? হযরত উমর (রা.)–র সামনে জিজ্ঞাসা করেন বিধায় তিনি বলছেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)–কে রেখে এসেছি। তখন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝলাম, কখনোই কোনো বিষয়ে আমি তাকে অতিক্রম করতে পারব না।

(সুনানুত তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাধীস–৩৬৭৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন: একটি যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি ভাবলাম হযরত আবু বকর (রা.) সবসময় আমাকে অতিক্রম করেন, আজ আমি তাঁকে ছাড়িয়ে যাব। এটি ভেবে আমি বাড়িতে গেলাম এবং আমার ধনসম্পদ থেকে অর্ধেক সম্পদ নিয়ে মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত করলাম। সে সময়টি ছিল ইসলামের জন্য ভীষণ কষ্টের সময়, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হন এবং মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর! বাড়িতে কী রেখে এসেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি লজ্জিত হলাম এবং বুঝে গেলাম, আজকে আমি সমস্ত শক্তিসামর্থ্য লাগিয়ে আবু বকরকে পেছনে ফেলতে চাইলাম, কিন্তু আজও আবু বকর আমাকে অতিক্রম করে গেলেন। (ফাযাইলুল কুরআন (৩), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড–১১, পৃ: ৫৭৭)

হযরত উসমান (রা.)–র আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে একটি বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান বিন হাবাব (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)–এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি উসরার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে (দানখয়রাতের) আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তখন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্‌র পথে একশ উট, তাদের কাঁধের পালান ও রশিসহ দান করলাম। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) আবার সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান জানালে হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) আবার দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি দু –শো উট, তাদের পালান ও কাঁধের সরঞ্জামসহ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করছি। এসব কথা শোনার পরও মহানবী (সা.) পুনরায় সৈন্যবাহিনীর জন্য দান করতে আহ্বান জানান। তখন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) পুনরায় দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় তিনশ উট, তাদের গদি ও হাওদাসহ প্রদান করার দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি মহানবী (সা.)–কে দেখি, তিনি (সা.) মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসছিলেন এবং তিনি (সা.) বলছিলেন, مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ - مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ অর্থাৎ এর পরে সে যা কিছুই করবে তার জন্য উসমান ধৃত হবে না, এর পরে সে যা কিছুই করবে তার জন্য উসমান ধৃত হবে না!

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন সামারা বর্ণনা করেছেন, হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এক হাজার দিনার উপস্থাপন করেন যখন তিনি জাইশুল উসরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন; তিনি তা তাঁর (সা.) কোলে রাখেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি (সা.) সেগুলোকে অর্থাৎ সেই দিনারগুলোকে তাঁর কোলে রেখে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং বলছিলেন, 'মা জাররা উসমানা মা আমেলা বা'দাল ইয়াওম'। অর্থাৎ আজকের কৃতকর্মের পর উসমানের আর কোনো ক্ষতি হবে না। এ কথা দুইবার বলেছেন।

এক বর্ণনানুযায়ী হযরত উসমান (রা.) সে সময় দশ হাজার দিনার প্রদান করেছিলেন আর তখন তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-র জন্য এই দোয়া করেছিলেন

غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا اَسْرَرْتَ وَمَا اَعْلَنْتَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يُبَالِيْ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا ,

অর্থাৎ হে উসমান! আল্লাহ্ তা'লা তোমার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন, যা তুমি গোপনে করেছ এবং যা তুমি প্রকাশ্যে করেছ এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। এরপর সে যা কিছুই করবে তার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (রা.) এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এক হাজার উট এবং সত্তরটি ঘোড়া প্রদান করেছিলেন। এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) সে সময় হযরত উসমান (রা.)-র জন্য এই দোয়া করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْ عُثْمَانَ فَاِنِّيْ عَنْهُ رَاضٍ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কেননা আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) তাবু কের যুদ্ধের সময় এত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেছেন যে, অন্য কোনো সাহাবী তা ব্যয় করতে সমর্থ হন নি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৪) (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭০০)

হযরত উসমান (রা.)-র একটি ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা নিয়ে ফেরত আসে। তখন তিনি (রা.) সৈন্যবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর তিন ভাগের এক ভাগ সম্পর্কে বলেন, আমি এর ব্যয়ভার বহন করব। তিনি (রা.) দশ হাজারের অধিক সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেন এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে, প্রত্যেক সৈন্যের জন্য যেন একটি করে জুতার ফিতাও তাঁর অর্থ থেকে ক্রয় করা হয়, অর্থাৎ তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ সামগ্রীও। এতে তাঁর দশ হাজার দিনার ব্যয় হয় যা উট ও ঘোড়া ব্যতীত ছিল। এছাড়া এক হাজার উট, একশ ঘোড়া এবং অন্যান্য সামগ্রীর পাশাপাশি এক হাজার দিনারও মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন। এই এক হাজার দিনার সেই দশ হাজার দিনার থেকে পৃথক ছিল যা তিনি দশ হাজার সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করেছিলেন। সে সময় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একশ উকিয়া রুপা প্রদান করেন। কতক বর্ণনানুযায়ী দু -শো উকিয়া রুপা প্রদান করেন। এই উকিয়াও একটি পরিমাণ যা সাড়ে দশ তোলার সমপরিমাণ। অর্থাৎ এক হাজার পঞ্চাশ বা দুই হাজার একশ তোলা পর্যন্ত রুপা অথবা সোয়া কিলোগ্রাম বা আড়াই কিলোগ্রাম রুপা; যদি বর্তমান যুগের তুলনায় বিবেচনা করা হয়।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, উসমান বিন আফফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারসমূহের মধ্য হতে ধনভাণ্ডার, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে ব্যয় করে। তাঁরা অনেক সম্পদ প্রদান করেছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) চারশ উকিয়া স্বর্ণ প্রদান করেছিলেন, অর্থাৎ চার হাজার দু -শো তোলা স্বর্ণ। অনেকে নয়শ উট উপস্থাপন করার কথাও উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, অনেক কুরবানীর কথা বর্ণিত আছে।

একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমার কাছে আট হাজার দিরহাম রয়েছে; চার হাজার দিরহাম আমি পরিবারের জন্য রেখে এসেছি আর চার হাজার দিরহাম আপনার সমীপে উপস্থাপন করছি। তিনি (সা.) তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে বলেন, بَارَكَ اللّٰهُ فِيْمَا اَمْسَكْتَ وَفِيْمَا اَعْطَيْتَ অর্থাৎ যে ধনসম্পদ তুমি পরিবারবর্গের জন্য রেখেছ আর যা আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেছ-আল্লাহ্ তা'লা সবকিছু বরকতময় করুন।

হযরত আসিম বিন আদী (রা.) সত্তর 'ওয়াসাক' (সে যুগের পরিমাপের একক) খেজুর উপস্থাপন করেন। এক ওয়াসাক ষাট সা' পরিমাণ। আর এক সা' প্রায় তিন সের। অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় বারো হাজার ছয়শ কেজি খেজুর। মহানবী (সা.)-এর কাছে সম্পদ উপস্থাপনকারী বা কুরবানীকারীদের মাঝে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ , হযরত সা'দ বিন উবাদা এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার নামও পাওয়া যায়। (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় ভাগ, পৃ: ৩৯৬-৩৯৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই যুগ ছিল যখন ঐশী ধর্মের জন্য মানুষ নিজেদের প্রাণ কুরবানীর প্রাণীর মতো উৎসর্গ করে দিত, ধনসম্পদ কুরবানীর কথা তো বলাই বাহুল্য! হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একাধিকবার নিজের সমস্ত ধনসম্পদ উৎসর্গ করেছেন, এমনকি একটি সুঁই পর্যন্ত নিজের ঘরে রাখেন নি। আর অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.)-ও নিজের সঙ্গতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এবং হযরত উসমান (রা.) নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী (কুরবানী করেন)। এভাবে এবং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সকল সাহাবী নিজেদের প্রাণ এবং সম্পদ এই ঐশী ধর্মের খাতিরে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের প্রিয়তম জিনিসকে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৯২) আর পুণ্য অর্জনের জন্য সাহাবীরা ব্যয় করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, অনেক সময় সাহাবীরা নিজেদের ঘরের সম্পদ এবং আসবাবপত্র বিক্রি করে যুদ্ধের খরচাদি জোগাড় করেছেন। বরং এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে, অনেক সময় তারা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে অন্যান্যদের জন্য ব্যয় করেছেন আর যুদ্ধে গমনকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। যাহোক, একবার মহানবী (সা.) বাইরে আসেন এবং বলেন, অমুক সফরে আমাদের সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে, কিন্তু মু'মিন সৈন্যবাহিনীর কাছে কোনো কিছুই নেই। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে পুণ্য অর্জন করতে চায়? হযরত উসমান (রা.) এটি শুনতেই উঠে দাঁড়ান এবং নিজের সঞ্চিত অর্থ বের করে মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যয়ভারের জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, উসমান জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে। (খুতবাতে মাহমুদ, খন্ড-১৯, পৃ: ৯৮-৯৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রা.)-ও আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে নিজের একটি খুতবায় এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন: একবার এক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন ছিল আর সে সময় কিছুটা আর্থিক সংকটও ছিল। পৃথিবীর রীতিই এমন; অর্থাৎ কখনো সচ্ছলতার দিন থাকে আবার কখনো অসচ্ছলতার দিন। তখনো আর্থিক সংকটের দিন ছিল আর যুদ্ধসামগ্রীরও প্রয়োজন ছিল। মহানবী (সা.) সকল সাহাবীর সামনে যথার্থ চাহিদা উপস্থাপন করেন এবং আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানান, যার ফলাফল এমন দাঁড়ায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে আসেন, হযরত উমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, [হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!] আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন, আমি দশ হাজার সাহাবীর যাবতীয় খরচ বহন করতে চাই। এর পাশাপাশি তিনি (রা.) আরো এক হাজার উট ও সত্তরটি ঘোড়া দান করেন। এভাবে সকল নিষ্ঠাবান সাহাবী তাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তাদের এই কুরবানীর সর্বোত্তম ফলাফল সৃষ্টি করেন।

(খুতবাতে নাসের, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪১)

এটি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করে। আমি প্রায় সময়ই ঘটনাবলি উল্লেখ করে থাকি; এমন অনেকেই আছেন, যারা নিজেদের যা কিছু আছে- সবই আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেন।

ধনীদের, বিত্তবানদের হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-র দৃষ্টান্ত সামনে রেখে নিজেদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করা উচিত। গরীব ও মধ্যবিত্তরা তো অন্যান্য কুরবানী করছে, তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অনেক ধনীও উন্নত পর্যায়ের কুরবানী করে যাচ্ছেন।

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যারা দুর্বল তাদেরও ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। এই যুগে তাদেরও কুরবানী করার সুযোগ আছে।

সাহাবীরা তাদের সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু উপস্থাপন করেছেন। আর তারা দরিদ্র ও অসহায় সৈনিকদের জন্য যানবাহন, তরবারি ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জামের যোগান দিয়েছেন। অনেক দরিদ্র সাহাবী বা সাহাবীয়া যখন এক-দুই মু দ শস্য দান করতেন, তখন তারা এই আকাঙ্ক্ষায় আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন যে, হায়! যদি আমাদের কাছে আরো থাকত তাহলে তা-ও দিয়ে দিতাম। কিন্তু মুনাফিকরা এই বলে উপহাস করত যে, এই মুষ্টিমেয় শস্যদানা দিয়ে নাকি এরা রোমান সম্রাট কায়সারকে পরাজিত করবে! মু দ মুষ্টির সমান ছোটো একটি পরিমাপ। আল্লাহ্ তা'লা এই মুনাফিকদের উপহাসের জবাবে বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (التوبة:79)

(সূরা তাওবা: ৭৯) অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে পুণ্য সম্পাদনকারীদের দানখয়রাত সম্পর্কে যারা অপবাদ দেয় এবং তাদের সম্পর্কেও– যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার মতো পায় না, আর তারা তাদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে; আল্লাহ্ তাদের ঠাট্টাবিদ্রুপের শাস্তি দেবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

কায়িকশ্রমের বিনিময়ে দানকারীদের মধ্যে হযরত আবু আকীল (রা.)-ও ছিলেন। তিনি সারারাত কূপ থেকে পানি তুলেছিলেন, আর এর বিনিময়ে পেয়েছিলেন দুই 'সা' খেজুর। এক 'সা' প্রায় আড়াই কিলোগ্রামের সমান, অর্থাৎ মোট পাঁচ কিলোগ্রাম খেজুর উপার্জন করেছিলেন। তা থেকে এক 'সা' তিনি পরিবারের জন্য রেখে বাকি এক 'সা' নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, একদা মহানবী (সা.) চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান। এক সাহাবী তখন কিছু কায়িকশ্রম করেন; সম্ভবত কারো কূপ থেকে পানি তুলেছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি (রা.) হয়ত আধ সের বা তিন পোয়া পরিমাণ শস্য উপার্জন করেছিলেন; তা তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তখন হাজার হাজার রুপির প্রয়োজন ছিল, আর মুনাফিকরা উপহাস করে বলত, এটানাকি যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে! এটি তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা, যা রোমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল। আর রোমান সাম্রাজ্য সে যুগে ততটাই ক্ষমতাশালী ছিল, যতটা এ যুগে ব্রিটিশ সরকার। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন একথা বলেন, সে সময় পৃথিবীতে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল।] আর এত বিশাল রাজত্বের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য সেই সাহাবী সামান্য কয়েক মুষ্টি যব নিয়ে আসেন। মুনাফিকরা এটি নিয়ে উপহাস করছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন এই বিষয়ে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তারা জানে না– আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এই যবের মূল্য কী! এ সেই যব যার কল্যাণে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে আর রোমানরা পরাজিত হয়েছে; আর কেবল রোমানরাই নয়, বরং পারস্য সাম্রাজ্যও– যারা রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ ছিল– তাদেরকেও মুসলমানরা পরাজিত করেছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৬-৪৭)

একজন সাহাবীর অদ্ভুত একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নিষ্ঠাবান সাহাবীরা কোনো না কোনোভাবে সফরের প্রস্তুতি এবং আর্থিক কুরবানীর সেই আহ্বানে অংশ নেওয়ার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছিলেন। সম্পদশালী সাহাবীরা নিজেদের ধনসম্পদ উপস্থাপন করছিলেন। গরীব ও নিঃস্ব সাহাবীরা পরিশ্রম করে সামান্য যা-ই পারিশ্রমিক পেতেন তা-ই উপস্থাপন করছিলেন। এমতাবস্থায় উরওয়া বিন যায়েদ (রা.) নামে এক সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি (রা.) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন একটি নিষ্পাপ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা অন্য সকলের থেকে ভিন্ন ও অনন্য ছিল। তিনিও রিক্তহস্ত কিন্তু নিষ্ঠাবান ছিলেন আর দান করার জন্য তার কিছুই ছিল না, আর তার জিহাদে অংশগ্রহণ করারও শক্তি ছিল না। অতএব, তিনি এক রাতে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন আর বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি জিহাদ করার আদেশ দিয়েছ আর এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছ। কিন্তু আমার কাছে কিছুই নেই আর তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে এতটা যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম নেই, যা তিনি আমাকে দিতে পারেন আর আমি তা দ্বারা যুদ্ধ করতে পারি। আর তোমার নবী আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করেছেন আর আমি তাতে অংশও নিতে পারছি না। তবে আমি নিজের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানের ওপর হওয়া সকল অন্যায় ক্ষমা করে সেই সব মুসলমানদের জন্য সদকা করে থাকি। যখন সকাল হলো তখন তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আজ রাতে নিজের সম্মানের সদকাকারী কোথায়? কেউ না দাঁড়ানোয় তিনি (সা.) আবার বলেন, কিন্তু এবারও কেউ দাঁড়াল না। পরিশেষে হযরত উরওয়া (রা.) দাঁড়ান আর তাঁকে (সা.) সকল কথা বলেন। তিনি (সা.) বলেন, اَبْشِرْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ অর্থাৎ, আনন্দিত হও! আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাকে সেসব মানুষের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের সদকা কবুল করা হয়েছে।

(আসসীরাতুন নববীয়া লি ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯)

কত অদ্ভুত সুন্দর নিষ্ঠা ও কুরবানীর চেতনা! আর আল্লাহ্ তা'লা যিনি হৃদয়ের অবস্থা জানেন আর যিনি সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তিনিও তার এই চেতনা কবুল করেছেন আর এর সংবাদও মহানবী (সা.)-কে দিয়েছেন।

সে সময় নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। তারাও এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নিজেদের অলংকারাদি উপস্থাপন করেছিলেন। যেভাবে হযরত উম্মে সিনান আসলামিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশার (রা.) ঘরে মহানবী (সা.)-এর সামনে একটি কাপড় বিছানো দেখি যাতে সুগন্ধি, বাহুবন্ধনী, কঙ্কন বালা, আংটি ও কানের দুল এবং নুপুরও ছিল যেগুলো নারীরা মুসলমানদের জিহাদের প্রস্তুতির জন্য দিয়েছিল।(কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮০-৩৮১)

যাইহোক, একদিকে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের অবস্থা এমন ছিল, আর অন্যদিকে এ সময়ে মুনাফিকরা নিজেদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়েছিল। একদিকে এটি মুনাফিকদের পক্ষ থেকে শেষ ষড়যন্ত্র ছিল আর মুনাফিকরা নিজেদের সাফল্যের বিষয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিল। তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখত, মুসলমানরা অবশ্যই সিরিয়া অভিমুখে এই লম্বা সফরে বের হবে। আর তারা এই শয়তানি বিশ্বাসেও প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) মহানবী (সা.) হয়ত মদীনা ফিরে আসতে পারবেন না। এজন্য তাদের চেষ্টা ছিল যেন কম সংখ্যক মুসলমান তাঁর (সা.) সাথে যায়, আর তাদের ধারণানুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা যত কম হবে, সৈন্যবাহিনীও ততই ছোটো হবে আর এই সেনাবাহিনীর পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত হবে। এ কারণে তারা বিরাজমান পরিস্থিতির সংকট, সফরের কষ্ট এবং সমস্যা অতিরঞ্জিত রূপে উপস্থাপন করা আরম্ভ করে। তারা মুসলমানদেরকে ভয় দেখাতে শুরু করে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদেরকে যোগ না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে, যেমন গরম তীব্র, পথ দীর্ঘ এবং যাতায়াতের মাধ্যম সীমিত। যেহেতু মদীনার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কৃষিজীবি ছিল, তাদের ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং দুর্ভিক্ষের সময় এই ফসল প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা মদীনার বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের সাথে এ কথা বলত যে, তোমরা জানো না– এখন তোমাদের যে সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে, তারা কতটা শক্তিশালী এবং যুদ্ধবাজ। তাদের সাথে যুদ্ধ করা সহজ কাজ নয়। তোমাদের দেখে আমাদের ধারণা হয়, তোমরা সবাই হয়ত মারা পড়বে নতুবা তোমরা সবাই তাদের হাতে বন্দি হয়ে যাবে। এগুলো ছিল মুনাফিকদের কথা। যদিও মুনাফিকদের এসব অপপ্রচারে উঁচুমাপের ও খাঁটি মু'মিনদের ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি। তথাপি কিছু দুর্বল ঈমানের লোকের হৃদয় এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, তারা যুদ্ধে না যাবার জন্য বিভিন্ন অজুহাত খুঁজতে থাকে। যদিও যারা এই ধরনের অজুহাত তৈরি করেছিল তাদের বেশিরভাগই ছিল মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের এসব অপপ্রচার এবং অজুহাত দিয়ে পেছনে থাকার কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ - فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -(التوبة:81-82)

(সূরা তাওবা: ৮১-৮২) অর্থাৎ যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা আল্লাহ্র রসূলের বিরোধিতা করে ঘরে বসে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। তারা তাদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছিল। তারা একে অপরকে বলেছিল, এই প্রচণ্ড গরমে (যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়ে) বাইরে যেও না। তুমি তাদেরকে বলো, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে বেশি উত্তপ্ত। হায়, যদি তারা বুঝত! অতএব তাদের উচিত, তারা যেন তাদের এই ধোঁকাবাজির কারণে কম হাসে আর নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফলের কারণে অধিক কাঁদে।

বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী, এই লোকগুলো মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিহাদে না যাবার জন্য নানা অজুহাত পেশ করত এবং অনুমতি চাইত, আমরা যেন যুদ্ধে না যাই। মহানবী (সা.) তাদের অনুমতি দিয়ে দিতেন। এমন ব্যক্তি আশিজনেরও বেশি ছিল, যারা নানা রকম অজুহাত ও ছলনার মাধ্যমে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি নিয়েছিল। এরা ছিল সেসব মুনাফিকের

বাইরে, যারা আব্দু ল্লাহ্ বিন উবাই প্রমুখের সঙ্গে ছিল।আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কু রআনে এ সমস্ত মুনাফিকের অজুহাতের পর্দা উন্মোচন করে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, তাদের পেছনে থেকে যাওয়া তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণেই হয়েছে আর তারা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়েছে।কুরআনে তাদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করে ভবিষ্যতে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হলো, যখনই ইমামের পক্ষ থেকে কোনো আহ্বান আসে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে কীভাবে 'লাব্বায়েক' বলা উচিত; তখন দ্বিধা না করে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং যতদূর সম্ভব সেই কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তু তি নেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ- عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ- لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ- اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ- وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ - لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ- لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ-

(সূরা আত-তাওবা: ৪২-৪৮)

"যদি দূরত্ব কম হতো আর যাত্রা সহজ হতো, তাহলে তারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করত। কিন্তু সেই কঠিন সফর তাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হলো। তারা অবশ্যই আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলবে, 'যদি আমাদের সামর্থ্য থাকত, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম।' তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ্ জানেন, তারা নিশ্চয়মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করুন। কারা সত্য বলেছে তা তোমার নিকট ভালোভাবে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদের না চেনা পর্যন্ত তুমি কেনইবা তাদের অনুমতি দিলে? যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তারা তোমার কাছে নিজ ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি চায় না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বিষয়ে সম্যক অবগত। তোমার কাছে কেবল তারাই অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে না। আর তাদের হৃদয় সন্দেহগ্রস্ত এবং তারা সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তারা যদি (জিহাদে) বের হবার সংকল্প রাখত তাহলে তারা এর জন্য নিশ্চয় প্রস্তুতিও নিত, কিন্তু (এ মহৎ উদ্দেশ্যে) তাদের অভিযাত্রাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন নি। তাই তিনি তাদেরকে (সেখানেই) বসে থাকতে দিলেন এবং (তাদের) বলা হলো, '(ঘরে) বসে থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।' তারা যদি তোমাদের সাথে (জিহাদে) বেরও হতো তাহলে তোমাদের মাঝে কেবল বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াতো। অথচ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার লোকও তোমাদের মাঝে রয়েছে। আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালো করেই জানেন। নিশ্চয় তারা আগেও নৈরাজ্য (সৃষ্টি করতে) চেয়েছিল এবং বিষয়াদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে তোমার কাছে উপস্থাপন করেছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য এসে গেল এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়ে গেল, অথচ তারা (তা) বড়োই অপছন্দ করত।"

সুতরাং মুনাফিকদের অবস্থা আল্লাহ্ তা'লা এতে স্পষ্টভাবে বর্ণ না করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-কে বলেন, তুমি তাদের মিথ্যা অজুহাত গ্রহণ করেছ। যদি গ্রহণ না করতে এবং অনুমতি না দিতে তাহলে তাদের কপটতাজনসম্মুখে উন্মোচিত হয়ে যেত, প্রকাশ পেয়ে যেত। যুদ্ধে তারা কোনোক্রমেই যেত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তাদের না যাওয়াটাই উত্তম। কেননা যদি কোনো কারণে তারা যুদ্ধে যোগ দিত তাহলে যুদ্ধের মাঝে এমন সব কর্মকাণ্ড করত যার ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এসব মুনাফিকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশিত হয় নি।

(আল লউলুল মাকনুন,সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৬১-৪৬২)

এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতে বণনা করব।

গত খুতবায় আমি রাবওয়ার মসজিদে আক্রমণের উল্লেখ করেছিলাম। যেসব আহমদী খোদ্দাম আহত হয়েছেন তাদের জন্য দোয়াও করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সব ধরনের জটিলতা থেকে রক্ষা করুন। কখনো কখনো পরবর্তীতেও কুফল প্রকাশিত হয়; এ ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এসব ঘটে থাকে। এ মুহূর্তে তিনজন খোদ্দাম গুরুতর আহত আর এই কারণে বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অবশিষ্ট পাঁচজনকে চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের (পূর্ণ) চিকিৎসা হতে ও বিভিন্ন আঘাত পুরোপুরি সারতে সময় লাগবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন; ভবিষ্যতেও প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে, প্রত্যেক ক্ষতি থেকে, প্রতিটি স্থানে জামা'তের সদস্যদের রক্ষা করুন।

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো, মুকাররম স্যাম আলী নেনা সাহেবের যিনি মার্শাল

আইল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন; সম্প্রতি তিরাশি বছর বয়সে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সর্বপ্রথম আমাদের মুরব্বী সিলসিলাহ হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেবের তবলীগের মাধ্যমে মাধ্যমে আশির দশকে ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হন। সে সময়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, তা সত্ত্বেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজ বিশ্বাসে অটল ছিলেন। একজন সিনেটর পার্লামেন্টে এই ঘোষণা দেন যে, ইসলাম একটি অবৈধ এবং সন্ত্রাসী ধর্ম । তখন তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে এই বার্তা দেন যে, আমরা আহমদী মুসলমান এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার এই সাহসী বক্তব্য জামা'তের জন্য দৃঢ়তার কারণ হয়। সেই সিনেটর আইনটি পাশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। নিজ এলাকায় তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

আমেরিকার নায়েব আমীর জনাব ফালাহ উদ্দীন শামস সাহেব লেখেন, আমার পাঁচ বছর মার্শাল আইল্যান্ডে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। যেহেতু দ্বীপটি আমেরিকার অধীনে ছিল তাই আমি সেখানে যেতাম। হাফেয জিব্রাঈল সাহেবের মাধ্যমে স্যাম সাহেব আহমদী হয়েছিলেন। শুরুতে চার-পাঁচটি পরিবার আহমদী ছিল এবং ছোটো জামা'ত ছিল। জামা'ত তখনও নিবন্ধিত হয় নি। কিন্তু হাফেয সাহেব ও তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জামা'ত সেখানে নিবন্ধিত হয়। হাফেয সাহেব সেখান থেকে চলে আসার পর একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে কোনো মুরব্বী ছিল না। এরপর স্যাম সাহেব নিজেই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জামা'তের দেখাশুনা করেছেন, তবলীগের কাজ করেছেন এবং কোনো অবস্থাতেই জামা'তের নাম ম্লান হতে দেন নি। গভীর আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করতেন। যখনই এখান থেকে কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সেখানে যেত, তিনি তাদের সহযোগিতা করতেন। সর্বদা আগ বাড়িয়ে কাজ করতেন এবং ফলপ্র সূ কাজ করতেন।

মার্শাল আইল্যান্ডে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি প্রথম সারিতে রয়েছেন। অধিকাংশ নও মোবাঈন তার প্রচেষ্টার ফলেই আহমদী মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি মার্শাল আইল্যান্ড জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন। শামস সাহেব আরো বলেন, যখন তিনি কোসরায়-তে মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যান, সেখানেও স্যাম সাহেব তাকে সাহায্য করেন। তার কিছু বন্ধুও এতে যোগ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে সেখানে মিশন হাউজ ক্রয় করা হয় এবং ভবন নির্মাণ করা হয়। অনু রূপভাবে কিরিবাতিতেও তার মাধ্যমে মিশন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা লাভ হয়। একইভাবে অপর একটি স্থানেও তার সহযোগিতায় মিশন প্র তিষ্ঠা হয়। তিনি বলেন, আমি একবার স্যাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মাঝে এমন কোন পুণ্য রয়েছে যার ফলে আপনি তিনটি দ্বীপে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন? তখন তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, এগুলো সব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ! আমার তো কোনো কৃতিত্ব নেই।

মার্শাল আইল্যান্ডের মুরব্বী সিলসিলাহ কাসেম চৌধুরী সাহেব বলেন, নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি নিজ ঈমানে অটল ছিলেন। নিজ সহধর্মিণীকে সাথে নিয়ে কুরবানী করেছেন এবং তার সহধর্মিণীর কুরবানীর ফলে একটি জমি ওয়াকফ হয়েছে। তার স্ত্রী নিজের এক খণ্ড জমি ওয়াকফ করেছিলেন, যার ওপর আজ মার্শাল আইল্যান্ডের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।তার ইসলামগ্রহণের ঘটনা তিনি নিজে এভাবে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, ১৯৮৭ সালে আমি এবং আমার স্ত্রী মেরি, লং

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 20 Nov 2025 Issue No.47

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আইল্যান্ডের একটি হোটেলে অবস্থান করছিলাম। একদিন সকালে আমরা রুম থেকে বাহিরে বের হয়ে একজন দীর্ঘ আফ্রিকান ব্যক্তিকে দেখতে পাই। আমি সালাম দিলে তিনিও সালামের উত্তর দেন। পরিচয়ের পরে জানতে পারি, তিনি মাইক্রোনেশিয়ার প্রথম মোবাল্লেগ হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব। যাহোক, পরবর্তীতেও তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকে এবং একটি ভালো সম্পর্কও গড়ে ওঠে। জিব্রাঈল সাহেব আমাকে তবলীগ করেন এবং বাইবেলের বিভিন্ন শ্লোক আমাকে দেখান এবং এ-ও বলেন যে, বাইবেলে হযরত ঈসা (আ.)-এর পর একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। আমি আশ্চর্য হলাম যে, কেবল একটি শ্লোক নয় বরং অনেকগুলো শ্লোক রয়েছে। এমনকি নতুন নিয়মে হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং বলেন, 'আমাকে যেতে হবে আর তিনি আমার পর অন্য কাউকে প্রেরণ করবেন।' (যোহন, অধ্যায় ১৬, শ্লোক ৭) তিনি বলেন, এগুলো এমন সত্য ছিল যা আমি পূর্বে কখনো শুনি নি, এবং হাফেয সাহেব আমাকে প্রত্যেকটি বিষয় বাইবেল থেকে খুবই স্পষ্ট করে বলতেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হিদায়াত দেন এবং আমি সত্য বিষয় বুঝতে পারি। আমার হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তিনি বলেন, সেই সময় যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং লোকেরা জানতে পারে তখন সরকারি কর্মকর্তারা বলে, আমরা ইসলামকে কখনো

মার্শাল আইল্যান্ডে বিস্তার লাভ করতে দেবো না। তিনি বলেন, এরপর আমি হাফেয সাহেবকে ফোন করি, তিনি তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না; আল্লাহ্ তা'লা পথ খু লে দেবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমন পথ খুলে দেন যে, একদিন আমি ঘরে বসে ছিলাম, এমন সময় এটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে এক ব্যক্তি আসে এবং আমাকে বলে, আপনার জামা'ত প্রতিষ্ঠার জন্য রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন হয়ে গেছে। কোথায় বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা বাধা দিতে চাচ্ছিল, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি স্বয়ং রেজিস্ট্রেশন অনুমোদনের ব্যবস্থা করে দেন এবং তা ঘরে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেই কপিটি হাফেয সাহেবকে পাঠিয়ে দিই। এরপর তিনি বলেন, যাহোক, সময় পার হবার সাথে সাথে আমি বুঝতে পারি আহমদীয়াত অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র এবং আমি এ কারণে গর্ব বোধ করি। সর্বদা আমার হৃদয়ে একটি আওয়াজ উঠত যে, আমি আহমদী মুসলমান এবং এজন্য আমি গর্বিত। তিনি বলেন, এখানে বিশ বছর যাবৎ কোনো মুবাল্লেগ আসেন নি এবং আমি এজন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্র স্ত ছিলাম। হাফেয সাহেব বলেন, আপনি যুগ-খলীফাকে চিঠি লিখতে থাকুন, কোনো না কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যাহোক, ২০০৪ সালে কেন্দ্র থেকে আমার কাছে নির্দেশনা আসে যে, একজন বিদেশি ব্যক্তি আসবেন, আপনি তাকে বিমানমন্দর থেকে নিয়ে আসবেন। তিনি বলেন, আমি বিমানবন্দরে যাই; কিছু সময় পর একজন ব্যক্তি হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন এবং আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। আমি বলি , স্যাম। তিনি উত্তরে বলেন, আমার নাম কাওসার। তিনি এনামুল হক কাওসার সাহেব ছিলেন (বর্ত মানে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল আমীর-অনুবাদক)। তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমরা দু ইজন ভাইয়ের মতো হয়ে যাই। আমরা একত্রে কোসরায়ে এবং পনপেই সফর করি। এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করি। এরপর আমরা যখন আলাদা হই তখন আমাদের সম্পর্ক এমন ছিল যে, আমরা যেন একে অপরকে দীর্ঘ সময় থেকে চিনি। এটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসলমান হবার পর আমার হৃদয় প্রশান্তি এবং আত্মা স্থিতি লাভ করে। নামায আমাকে পরিবর্তন করে দেয়। আমার স্ত্রীও আমার মাঝে পরিবর্তন বুঝতে পারে। এরপর থেকে যখনই আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে চাইতাম এবং আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করে দিতেন। অসংখ্যবার আমি এই সাহায্য নিজ চোখে দেখেছি এবং প্রত্যেক দোয়াতে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

তার দৌহিত্রী জুলিয়া বলেন, তিনি খুবই নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন যিনি তার ঈমানের মাধ্যমে সান্ত্ব না ও শক্তি লাভ করতেন। অধিকাংশ সময় ইবাদতে পার করতেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকে খুবই পছন্দ করতেন। বিভিন্ন ইসলামী পুস্তক পাঠ করতে থাকতেন। অধিকাংশ সময় আমি তাকে গভীর চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকতে দেখতাম। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন; তার পরিবারের কয়েকজন ব্যক্তি আহমদী নন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দিন যেন তার বংশ থেকে তারাও আহমদী হয়ে যান। (আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল,৭ নভেম্বর, ২০২৫)

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ..) **********

এটাই স্বীকার করে। আমার বিশ্বাস, ইউরোপ এই শিক্ষা পরিত্যাগ করে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং আমরা নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়েছি। তাই এখন থেকে আমি শুধু আপনাদের কাছেই আসব।" তিনি স্বয়ং আমাকে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরও আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন।

একইভাবে, একজন জার্মান মহিলা যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কথোপকথনে তিনি উল্লেখ করলেন যে জেনারেল নাজীব তাঁকে সৌদি আরবের রাজা'র কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি তাঁর ছেলের জন্য তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। আমি মজা করে বললাম, "আপনি রক্ষা পেয়েছেন, কারণ তাদের অনেক স্ত্রী থাকে।" তিনি বললেন, "সবাই স্ত্রী নয়; প্রকৃত স্ত্রী তো একজন-বাকিরা উপপত্নী।" তারপর তিনি জুড়লেন, "যেহেতু ইসলাম মুসলমানদেরকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে, এবং আমিও একজন মুসলিম হয়েছি, তাহলে আমি কেন আপত্তি করব? তিনি আরও বললেন: "আমি বহুবার যাজকদের সাথে বিতর্ক করেছি। একবার এক যাজক বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি নির্বোধ মানুষ। এখানে আমি নারী-অন্য স্ত্রী হলে আমারই হবে, আপনার নয়। আমি এতে আপত্তি করি না-আপনি অকারণে বিরক্ত হচ্ছেন। আমি ইসলামের এই শিক্ষাকে বরকত মনে করি, কারণ ইসলাম যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়, তবুও সে আদেশ দেয় যে তাদের সমান খাদ্য, সমান বস্ত্র, এবং সমান বাসস্থান দিতে হবে। যখন ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়, তখন নারীর আপত্তি কোথায়? আমরা দীর্ঘদিন প্রেম করে বিয়ে করি, তবুও দুই বছরের মধ্যেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু বহুবিবাহে, স্বামীর সাথে ঝগড়া হলে অন্তত আমি আমার নিজের ঘরে থাকব, আর আমার সহ-স্ত্রী তার ঘরে থাকবে। সন্ধ্যায় আমি স্বামীকে ধরে তার ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারব, বলব: 'সারাদিন তোমার বিরক্তিকর মুখ দেখেছি, এখন অন্য স্ত্রী দেখুক।' যদি প্রেম আগে থেকে নিশ্চয়তা দিত যে কখনো ঝগড়া হবে না, তাহলে হয়তো আপনার কথা মানা যেত। কিন্তু যেহেতু ঝগড়া হয়ই, কমপক্ষে এই শিক্ষার সুবিধা হলো, স্বামীর সাথে বিবাদ হলে স্ত্রী তাকে অন্য স্ত্রীর ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারে এবং সারাদিন তাঁর রাগী মুখ না দেখলেও চলে।'

আমি যখন এই ঘটনা সেই সংগীতশিল্পীকে বললাম, তিনি বললেন, "আপনি শুধু সেই অঞ্চলের কথা বলছেন; আমি আপনাকে লন্ডনে দশ হাজার নারী দেখাতে পারি যারা-যদি পুরুষরা ন্যায়বিচার করত-স্বামীরা একাধিক স্ত্রী নিলেও সহজেই রাজি হতেন। কিন্তু সমস্যা হলো, সমাজের নৈতিক অবস্থা এমনভাবে অবনতি হয়েছে যে ভালো স্বামী আর পাওয়া যায় না।"

অতএব লক্ষ্য করুন, তাদের মধ্যে কী গভীর পরিবর্তন ঘটছে।

(তাফসীর-এ-কবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৮৭, কাদিয়ান সংস্করণ, ২০১০)

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir